দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ৫ জানুয়ারি, ২০২৬
২০ পৌষ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭
website : www.eswastika.com

# কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২০ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৫ জানুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com


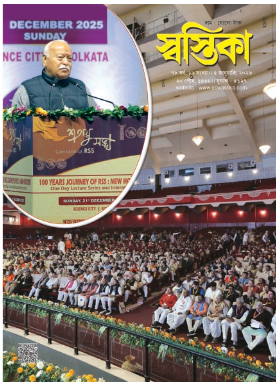



**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ◻ ৫

**রাজ্যের মানুষের হারিয়ে যাওয়া ভোটাধিকার ও সাহস জোগাচ্ছে নির্বাচন কমিশন নির্বিষকরণ কমিশন**

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**রানির হুমকি মানতে হবে** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**নরক যন্ত্রণায় বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা**

◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ৮

**পশ্চিমবঙ্গে সুদিন আসতে কতদিন সময় লাগতে পারে?**

◻ কৌটিল্য ◻ ১০

**গীতা ও বিবেকানন্দকে না জেনেই কমিউনিস্টদের মন্তব্য তাদের অসারতা ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার বহিঃপ্রকাশ**

◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১১

**স্বাদেশিকতা, জাতীয় চেতনা ও ভারত গঠনের মহান স্বপ্নের নাম স্বামী বিবেকানন্দ** ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ১৪

**সেকুলার গান! বাঙ্গালি হিন্দুর সাবধান হওয়া উচিত**

◻ পারমিতা গুপ্ত ◻ ১৫

**ওরা আজও কেন হিন্দুনিধনকারী বাবরকে চায়?**

◻ বটু কৃষ্ণ হালদার ◻ ১৭

**কলকাতায় সরসঙ্ঘচালক : বক্তৃতামালা—হৃদয়-মনে রাষ্ট্রীয় বিচারধারার বীজ বপন করে সঙ্ঘোপলব্ধি** ◻ ২৩

**কলকাতায় বক্তৃতামালা—প্রশ্নোত্তর** ◻ ৩২

**গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস** ◻ ৫০

**নিয়মিত বিভাগ :**

◻ **সুস্বাস্থ্য : ২১-২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **চিঠিপত্র : ৪৮-৪৯** ◻

প্রকাশিত হবে
১২ জানুয়ারি
২০২৬

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১২ জানুয়ারি
২০২৬

## জেহাদিদের কবলে বাংলাদেশ

জেহাদিদের কবলে পড়েছে বাংলাদেশ। বেছে বেছে হিন্দু সহ বাংলাদেশের সমস্ত সংখ্যালঘুর ওপর চলছে নৃশংস অত্যাচার। নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিসংযোগ এমনকী জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ডুবে গেছে দেশটি। সেই সঙ্গে সমান তালে চলেছে ভারতবিরোধিতা, ভারতবিরোধী স্লোগান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## সঙ্ঘ শতবর্ষ ঃ এক নবদিগন্ত

মহাকালের নিকট একশত বৎসরের হয়তো কোনো গুরুত্ব নাই, কিন্তু মনুষ্যজীবন অথবা মনুষ্য সৃষ্ট কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রজীবনের পুনরুত্থান তথা রাষ্ট্রসেবার ব্রত লইয়া সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত বিজয়াদশমীতে শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছে। সঙ্ঘের এই যাত্রাপথ কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। জাতির পরাধীনতার কালখণ্ডে বৈদেশিক শাসক ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হইল, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশীয় সরকারও বৈদেশিক শাসকের চাইতে বহুগুণ কঠোরতার সহিত বিরোধিতা করিয়াছে। বিভিন্ন অজুহাতে তিনবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। কংগ্রেসের সহিত কমিউনিস্টরাও সমানভাবে বিরোধিতা করিয়াছে, এমনকী বহু স্বয়ংসেবককে হত্যাও করিয়াছে। তাহাতেও সঙ্ঘের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে না পারিয়া জনমানসে ভ্রম সৃষ্টির অভিপ্রায়ে অপপ্রচারে মাতিয়াছে। উপহাস,উপেক্ষা, বিরোধিতা, আক্রমণ, হত্যা— কোনো কিছুকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বয়ংসেবকগণ তাঁহাদের লক্ষ্যপথে অবিচল থাকিয়াছেন। নানা প্রকার বিরোধিতাকে তাঁহারা অগ্নিপরীক্ষা মনে করিয়াছেন এবং প্রতিটি অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার সহিত তাহাদের মনোবলও অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে। সঙ্ঘ কাহারও বিরোধিতা করিবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদের কখনোও প্রত্যাঘাত করে নাই। সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী স্বয়ংসেবকদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন, যাহারা ভুলবশত সঙ্ঘকে আঘাত করিতেছে, তাহারা আমাদের সমাজেরই ভ্রাতৃসদৃশ। তিনি উদাহরণ সহকারে বলিয়াছেন, মুখাভ্যন্তরে দন্ত কখনো কখনো জিহ্বাকে আঘাত করিয়া বসে, সেই কারণে দন্তসকল উৎপাটিত করা হয় না। সঙ্ঘের এই সমাজবোধের কারণে সমগ্র সমাজ সঙ্ঘকে আপনার করিয়া লইয়াছে। সমাজজীবনের যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই স্বয়ংসেবকগণ সেবার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। সঙ্ঘ আজ জনমানসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া দেশবাসীর সমাজবোধ অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য সঙ্ঘ নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে যাহা সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাদৃত হইয়াছে।

স্বয়ংসেবকগণ ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে স্বয়ংসেবক একত্রীকরণ, বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন, সামাজিক সমরসতা নির্মাণের জন্য সদ্ভাবনা সভা এবং গৃহসম্পর্ক সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার নিমিত্ত সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকও সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিতেছেন। গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ হইতে ২১ তারিখ তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে সাড়ে সাতহাজার ছাত্র-যুবার সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন। নবীন প্রজন্মের এই ছাত্র-যুবার সম্মুখে তিনি সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রা এবং রাষ্ট্রনির্মাণে সঙ্ঘের ভূমিকার কথা উপস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে যুব সমাজ অনুপ্রাণিত হইয়াছে, অনেক যুবক-যুবতী সমাজ সেবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে, কলকাতায় 'সঙ্ঘের শতবর্ষ ঃ এক নবদিগন্ত' শীর্ষক বক্তৃতামালায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ষোড়শ শতেরও অধিক প্রবুদ্ধ নাগরিক অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সঙ্ঘ সম্পর্কে সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া নিকট হইতে সঙ্ঘকে উপলব্ধি করিয়াছেন। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে সঙ্ঘের ভূমিকার বিষয়ে তাঁহারা সরাসরি সরসঙ্ঘচালককে প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তরও পাইয়াছেন। সমগ্র দেশে এইরূপ বেশ কয়েকটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই কার্যক্রমগুলি অবশ্যই সঙ্ঘ সম্পর্কে সমস্ত প্রকার ভ্রান্তি ও অপপ্রচারের নিরসন করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। স্বয়ংসেবকগণ বিশ্বাস করেন, সঙ্ঘকার্য ঈশ্বরীয় কার্য। কারণ রাষ্ট্র এক জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে সরসঙ্ঘচালকের প্রবাস বঙ্গজীবনের মন জয় করিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভূমিতেও সঙ্ঘের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হইল।

## সুভাষিতম্

**আয়ুষঃ ক্ষণ একোহপি সর্বরত্নৈর্ন লভ্যতে।**
**নীয়তে তদ্ বৃথা যেন প্রমাদঃ সুমহানহো।।**

**অর্থ ঃ** সমস্ত রকম ধনরত্ন দিলেও জীবনের একটি ক্ষণও ফিরে পাওয়া যায় না। সুতরাং এরকম জীবনকে বৃথা কাটিয়ে দেওয়া মস্তো বড়ো ভুল।

## রাজ্যের মানুষের হারিয়ে যাওয়া ভোটাধিকার ও সাহস জোগাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

# নির্বিষকরণ কমিশন

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো উপহার— 'নির্বাচন কমিশন'। অনেকটা দেবদূতের মতো রাজ্যের জাল আর ভুয়ো ভোটার ধরা এবং রাজ্যের ভোটার তালিকা নির্বিষ করে তোলার কাজে তারা হাত দিয়েছে। এটা সকলেই মানবেন যে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ভিতর দিয়ে কমিশন রাজ্যের মানুষের মধ্যে সাহস এবং ভোট দেওয়ার উদ্যম ফিরিয়ে এনেছে, যা কিনা ১৯৭২ সালের পর থেকে প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। ১৯৭৭ ও ২০১১ তার ব্যতিক্রম। ১৯৪৭-এর পর তিন দশক এবং ১৯৭৭-এর পর প্রায় চার দশকের ব্যবধানে ওই দু'বছর রাজ্যে সরকার পালটানোর ভোট পড়ে। মাঝখানে যুক্তফ্রন্টের সময়, ১৯৬৭-১৯৭১ তিন বছরের জন্য ডামাডোলের সরকার তৈরি হয়। সে স্মৃতি রাজ্যের ভোটারদের মন থেকে মুছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম আর ধরন-ধারণ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ত্রাসের মধ্যে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল ধরেই নিয়েছে, যে জাল ও ভুয়ো ভোটার বাদ পড়ছে, তাদের অধিকাংশ হলো তৃণমূলের ভোটার। তা যদি সত্য নাও হয়, তবুও কেবল নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা করার জন্য তারা যুক্তিহীন দাবি তুলছে। তাদের সে ভীতি তৃণমূলি নেতাদের অর্থহীন চিলচীৎকার থেকে বোঝা যাচ্ছে।

একসময় জাল আর ভুয়ো ভোটারের দয়ায় বিদেশি সিপিএম ভোট জিতত। ২০১১-তে হেরে যাওয়ার পর তারা তা স্বীকার করেছিল। তৃণমূলের উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশনকে ভুল প্রমাণ করা। আর এই 'ভুল' প্রমাণ করতে গিয়ে তৃণমূল নেতারা নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল ঠাউরেছে। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। কাজটা যে সংবিধান-বিরোধী তা বোঝার মানসিকতা ও সুবুদ্ধি তৃণমূল নেতাদের নেই। গণতান্ত্রিক ভারতে প্রতিবাদ করার অধিকারের অর্থ দেশ বা সংবিধান বিরোধিতা হতে পারে না সেটা তৃণমূলের মতো পরিবারতান্ত্রিক আর হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা দলের পক্ষে বোঝা কঠিন।

রাজনীতি স্মৃতিনির্ভর। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম। কংগ্রেস পার্টি ও ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাস তৈরি হয়েছে শত বছরের রাজনৈতিক পথ ধরে। এর বিপ্রতীপে শতবর্ষের রাজনৈতিক শিকড়হীন দল হলো তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে তৃণমূলের কাছ থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আশা করাটাই স্বাভাবিক। অবাক করার মতো বিষয় হলো, রাজ্যের যে ভোটাররা প্রাগৈতিহাসিক কংগ্রেস আর বিদেশি বাম দলকে যথাক্রমে তিন ও চার দশক ক্ষমতায় রেখেছিল, তারা কচি তৃণমূলকে সহ্যের সীমার মধ্যে রেখেছে। নির্বাচন কমিশন রাজ্যে যে প্রকৃত ভোটারদের তালিকা তৈরি করছে এবং ভুয়ো ভোটারদের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে বাদ দিচ্ছে, তার সদুত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা তৃণমূলের নেই। তৃণমূলের দৃষ্টিতে সব ভুয়ো ভোটাররাই হলো তাদের ভোটার। তাদের কত ভুয়ো ভোটার বাদ পড়ছে সেই তালিকা নিয়েই তারা ব্যস্ত। ফেব্রুয়ারি মাসে পরিষ্কার হয়ে যাবে কোন জাদুতে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। ২০১১ পরবর্তী পর্যায়ে এতরকম দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর বা শাসক বিরোধী মনোভাবের ভোট কেন কাজ করে না ইত্যাদি বিষয়গুলি আগামীদিনে স্পষ্ট হতে পারে। ভোট চুরি রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিষয় নয়। ২০০২ সালে দেশজুড়ে শেষবারের মতো ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন হয়। তারপর ২৩ বছরের মধ্যে ১৩ জন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কেন ভোটার তালিকা সংশোধনের কোনো চেষ্টা করেননি, তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রধানত কংগ্রেস এখন এই দাবি তুলেছে যে, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতি কভাবে পক্ষপাতদুষ্ট, আর তৃণমূলের মতো কিছু পোঁ-এর দল তাতে সুর মিলিয়েছে। ১৩ জন কমিশনারের ভিতর দু'জন কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু কাঁচের ঘরে বসবাস করা অন্যের দিকে ঢিল ছোঁড়ার অধিকার বোধহয় হাস্যকর! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে ঠাট্টা করেছেন। তাকে অনেকে 'হাওয়াই চটি' বা 'চটি পিসি' বলে ডাকে।

উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১৮ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাংশ অপ্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। বিহারে বাদ গিয়েছিল প্রায় ৮ শতাংশ। অসমেও প্রায় তাই। নির্বাচন কমিশনের মুঠি যত শক্ত হচ্ছে, তৃণমূলের নেতাদের প্রতিবাদের চীৎকার তীব্র হয়ে উঠছে। একদিকে তারা চিল চীৎকার জুড়ছে, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করতে চেয়েছে। গণতান্ত্রিক ভারতে সে অধিকার তার থাকলেও কাজটা কতটা 'গণতান্ত্রিক' তার বিচার প্রয়োজন। অভিষেকবাবুর লড়াই যতটা না দলের বাইরে, তার থেকে বেশি অন্দরে। মতুয়া ভোটকে সামনে রেখে কমিশনকে আটকাতে চাইছে তৃণমূল। তাতে কমিশনের রাজ্যের ভোটার তালিকা নির্বিষকরণের কাজ বন্ধ হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস তা অচিরেই টের পাবে।

*(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

# রানির হুমকি মানতে হবে

হুমকিদাত্রীষু দিদি,

ভয় পেলে মানুষ ভুলভাল বকে, কিন্তু এমন মস্তানির সুরে কথা বলতে পারেন কি কোনো মুখ্যমন্ত্রী! দিদি আপনি কিন্তু পারেন। এমন হুমকি দিতে পারেন যাতে এই রাজ্যেরই বাসিন্দা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের প্রাণসংশয় হতে পারে। আপনি সেটা প্রকাশ্যে করলেন। একেবারে মস্তানির সুরে। আমি শুনতে শুনতে ভাবছিলাম কী সুন্দর ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় একজন মুখ্যমন্ত্রী নিরাপরাধ সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে দলের ন্যাপলা-ভোপলাদের লেলিয়ে দিলেন।

নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মীরা নিযুক্ত রয়েছেন, সে বিষয়ে দলীয় সভা থেকে তথ্য তলব করেছেন আপনি দিদি। কী বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অনেককে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রত্যেক এলাকায় খবর রাখুন তো, কাকে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা কোন দপ্তরে কাজ করেন, কোথায় থাকেন। আমরা ডিটেলস চাই।' এর পরে আপনি কিছুক্ষণ থামলেন। হাততালি পড়ল কর্মীদের। তার পরে বললেন, 'আমি তাঁদের সহযোগিতা করব, কিন্তু আমার ডিটেলস চাই।'

এই যে থামলেন সেটা দিদি আপনার পুরনো কায়দা। অতীতেও করেছেন। কদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের কাগজ প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে ছিড়ে ফেললেন। যেটা বেআইনি। তার পরে বললেন, আমি নিজের নোট ছিড়েছি। এ দিনও প্রথমে দলের কর্মীদের বলে দিলেন, তোমরা খোঁজখবর নাও। কাদের খোঁজ নিতে হবে! প্রায় ৪৬০০ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের যাঁদের মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার আগেই হুঁশিয়ারিটা দিয়ে দিলেন।

সবার মনে প্রশ্ন, এই কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী কি সহযোগিতা করবেন! কেন তাঁদের তথ্য তালাশ করছেন! নবান্ন চাইলে বা পুলিশকে দিয়ে সেটা তো এক নিমেষে করিয়ে নিতে পারতেন। দলের গোপলা-ন্যাপলা, ভোপলাদের কেন বললেন! কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের পরিবারকে চমকে দিতে হবে বলে! কেন হাততালির পরে সংশোধন করলেন সহযোগিতার। আপনি তো তার আগেই দলের অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের লেলিয়ে দিয়েছেন! কেন এই মস্তানির সুর। নিজের কেন্দ্রে ৪৪ হাজার ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার পরে রাজ্যের এক কোটি অবৈধ ভোটার কমে যাওয়ার ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে যেতেই পারে। তাই বলে একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি এই ভাবে কোনো সরকারি কর্মীকে গুন্ডাদের হাতে নিগৃহীত করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন! এই সরকারি কর্মীরা তো সাধারণ মানুষ। তাঁদের পরিবার রয়েছে। তাঁরা তো অনেকে তৃণমূলের ভোটারও। তাঁদের সন্তান, পরিবার রয়েছে। পাড়ার তৃণমূল কর্মীর নজরদারি শুরু হলে তাঁরা কি শান্তিতে, নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারবেন। এই সব প্রশ্ন যাঁরা করছেন তাঁদের আমি দিদির হয়ে বলছি, তিনি এই রাজ্যের রানি। যা চাইবেন বলবেন, করবেন। যা করার করে নিন। ঠিক বলেছি তো দিদি?

এর আগে গত ২৮ জুলাই বীরভূমের সরকারি বৈঠক থেকে বিএলওদের উদ্দেশে আপনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর দায়িত্ব নেয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে এবং পরে রাজ্য সরকারের হাতেই প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে। আপনারা রাজ্য সরকারের চাকরি করেন।' সেদিন নেতাজী ইন্ডোরে আপনি বলেছেন, যে বিএলওদের মৃত্যু হয়েছে তার দায় কমিশনের। আমি বলছি না, তবে কেউ যদি আজ প্রশ্ন করে, বীরভূমের সেই হুঁশিয়ারির জন্য প্রাণভয়ে চরম পথ বেছেছেন অনেকে! আমি বলব, দিদিই ঠিক। বললেই হলো দিদির চাপের কথা। রানিমা যা ভালো বুঝেছেন বলেছন। ব্যাস।

দিদি, আমি নিজে সেই সময়ে বিএলওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে তাঁরা শাঁখের করাতে রয়েছন। সঠিক কাজ না করলে কমিশনের কোপ। আর ঠিকঠাক কাজ করলে আর তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলে চাকরি যাওয়ার ভয়!

কাজ হয়েছিল দিদি। মনে আছে দিদি, গত ২৯ অক্টোবর আপনার ভাইপো অভিষেক বলেছিলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের (জাতীয় নির্বাচন কমিশনার) বাবার নাম আছে ভোটার লিস্টে? দেখাতে পারবেন? রেলমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারবেন বাবা-ঠাকুর্দার জন্মের সার্টিফিকেট?' সেখানেই না থেমে অভিষেক বলেছিলেন, 'বিজেপির লোকেরা এলে বাবা-ঠাকুর্দার সার্টিফিকেট চাইবেন। না দিতে পারলে বেঁধে রাখবেন।' এই হুঁশিয়ারিগুলো কি মস্তানের মতো নয়! দেশের আরও রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সেখানেও বিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু শাসক দল কিংবা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই ভাবে কোথাও হুমকি দিয়েছেন? এমন মস্তানি দেখিয়েছেন? এসব প্রশ্ন দুষ্টু লোকেরা করছে দিদি। আমি খালি বলছি, রানি ইজ রানি। তিনি সব বলতে পারেন। □

# নরক যন্ত্রণায় বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা

**রঞ্জন কুমার দে**

২০০৭ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র আলপিনে প্রকাশিত এক কার্টুন তৎকালীন সময়ে এক আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেখানে মোল্লাবাদীরা কার্টুনের সঙ্গে মহম্মদের অপমানের এক সংযোগ খুঁজে পেয়েছিল। তার ফলস্বরূপ কার্টুনিস্ট আরিফুল রহমানকে জেলে সাজা ভোগ করিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। মোল্লাবাদীদের দাবি ছিল 'প্রথম আলো' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করার এবং সেই কার্টুনিস্টকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার। তাই ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশে যে দীপু চন্দ্র দাসের ভুয়া ইসলাম অবমাননায় নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং প্রথম আলো-র প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ সেটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এটা ধারাবাহিক মোল্লাবাদী চিন্তার আস্ফালন। ১৯৪৭-এর পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ হিন্দু নিধনের মুক্ত বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে সেখানে হিন্দু নির্যাতনের স্ট্রাইকরেট দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোনো না কোনো ঘটনা ঘটছেই দেশটির সর্বত্র।

তথাকথিত ইসলাম অবমাননার অভিযোগে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল, বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, সরকারি চাকরিতে পদচ্যুতি, মঠ-মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দেবদেবীর প্রতিমা ভাঙচুর কোনো কিছুই বাদ নেই তালিকায়। প্রাণ ভয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দলে দলে কট্টর ইসলামি সংগঠন জামাত-ই-ইসলামিতে নাম লেখাচ্ছেন। হিন্দুদের ন্যায়ের জন্য আওয়াজ ওঠানোতে ইসকনের চিন্ময় দাস প্রভুকে বিনা দোষে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দেশটির প্রায় প্রতিটি জেলে হাজারখানেক হিন্দু যুবককে ইসলাম অবমাননার ভুয়ো অভিযোগে জেলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। আওয়ামি লিগের অনেক নেতা-মন্ত্রীরা খোলা আকাশের নীচে বিচরণ করতে পারলেও আওয়ামি লিগ, ভারতীয় দালাল ট্যাগের আইনি মারপ্যাঁচে ফেলা হচ্ছে সাধারণ হিন্দুদের। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তপ্ত ভারত বিরোধী যুবনেতা উসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে, বিনা প্রমাণে অভিযোগের তির সেই আবার ভারতের দিকে। ভারত নাকি তাকে হত্যা করিয়ে আসামিদের ভারতে আশ্রয় দিয়েছে, অথচ এরা নিজেদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোনো গাফিলতি খুঁজে পায় না। হাদি ছিল স্বঘোষিত মব সন্ত্রাসী যাকে নির্বাচনী প্রচারে গেলে উঁচু ভবন থেকে খারাপ জল নিক্ষেপ করা হতো; ভোটের আগে প্রচার চলাকালীন ভোটাররা যার থেকে মুখ সরিয়ে নিতেন। হাদি ছিল সেই লোক, যে আপাদমস্তক ভারত বিদ্বেষী ও পাকিস্তান-প্রেমী, যার মুখের ভাষা ছিল অশ্লীল। নিজের মায়ের বয়সি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও সে চরম নোংরা ভাষায় আক্রমণ করতো। হাদির সমাধি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের সন্নিকটে করা হয়েছে যার তুমুল আপত্তি করেছেন কাজীর পরিবার। উল্লেখ্য যে, হাদির শেষ জানাজায় দেশটির জঙ্গি সংগঠনের অনেক নেতাকেও উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে।

হাদির মৃত্যুতে তার মানসিকতার মোল্লাবাদীরা সেখানকার দু'টি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট, উদীচী কার্যালয় আগুনে ভস্মীভূত করেছে। অভিযোগ এরা নাকি ভারতীয় অ্যাজেন্ডা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করতে ভূমিকা রাখে। হাদি হত্যার সঙ্গে সেখানকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংগঠনের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ নেই তবুও একই দিনে মোল্লাবাদীরা গরিব গার্মেন্ট কর্মচারী দীপু চন্দ্র দাসকে ভুয়ো ইসলাম অবমাননার অভিযোগে পিটিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। অতীতে এরকম ভুরি ভুরি সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটে আসছে প্রতিবেশী মোল্লাবাদী এই দেশে, কিন্তু বারংবার সেখানকার সরকার, প্রশাসন, মিডিয়া প্রত্যেকটি ঘটনাকে ভুয়ো, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ভারতীয় প্রোপাগান্ডা প্রভৃতি বলে শুধু শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছে। কিন্তু এইবার সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দীপু চন্দ্র দাসের আদিম যুগের মতো নির্মম হত্যাকাণ্ড গোটা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় রাজনীতিতেও কখনও এবারের মতো বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। আগে একসময় ছিল বাংলাদেশের ধর্মীয় নিপীড়নকে অতিরঞ্জিত আখ্যায়িত করা হতো কিন্তু এইবার গেরুয়া শিবির ছাড়াও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, আসাদউদ্দিন ওয়েসি, বদরুদ্দিন আজমলরা বেশ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলিউড থেকেও উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহল তথা দ্য ইউনাইটেড নেশনস্, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, বিভিন্ন দেশের সংসদ প্রভৃতিতে দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের চরম নিন্দা করা হয়েছে। ভারত, নেপাল, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তে দীপু হত্যার নির্মমতা সব হিন্দুদের হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়েছে। অতীতে বাংলাদেশে দফায় দফায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিপীড়ন চললেও অসমের অসমীয়া হিন্দুরা কোনোভাবে রাজপথে এসে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। এখন সকল শ্রেণীর হিন্দুরা জাতপাত, আঞ্চলিক বৈষম্য ভুলে হিন্দু ঐক্যের গুরুত্ব বুঝতে পারছে।

প্রথম আলো-র কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ হোক কিংবা দীপু দাসের হত্যা— সবক্ষেত্রে সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা রয়েছে। কারণ এর আগেও বিগত দিনে সংবাদ মাধ্যমটির কার্যালয়ে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, প্রত্যেকটি সামাজিক মাধ্যমে দেশ বিদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানটির উপর ভারতপ্রীতির এক ন্যারোটিভ তৈরি করা হয়েছিল। সংস্থাটির পরিচালক বারংবার সরকারের কাছে নিরাপত্তার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। রাজধানীর বুকে কয়েকতলা ভবন কয়েকঘণ্টা জ্বললেও প্রশাসন পুরো ঘটনায় হাত গুটিয়ে ছিল। ২০০৭ সালের পর ২০২৪ সালেও তাঁদের ভারতপন্থী, ভারতীয় আগ্রাসন এইরূপ আখ্যা দিয়ে তৌহিদি জনতা তথা সেখানকার আলেম-ওলামা, কট্টরপন্থীরা কার্যালয়টির সামনে জিয়াফত অর্থাৎ (গোরু জবাই করে খাওয়ার আয়োজন) এবং মব আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই সময় কপালজোরে বেঁচে গেলেও ২০২৫-এ শেষ রক্ষা আর হয়নি। ডেইলি স্টারকে এরা দিল্লি স্টার, দিল্লির দাসত্বকারী এইরূপ বিদ্রূপ করে। ইউনুস সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য নাহিদ ইসলামও মনে

করেন সরকারের অঙ্গুলি হেলন না থাকলে দেশে এরকম মব তৈরি করে ধারাবাহিক অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্ভব হতো না। দীপু দাস হত্যা সংঘটিত হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে, পোশাক কারখানার ম্যানেজমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন ইচ্ছে করেই দীপুকে মরণফাঁদে ঠেলে দিয়েছিল। কারণটা তারা ভালোভাবেই জানে যে দেশে সংখ্যালঘু হত্যার কোনো বিচার হবে না। গত ১ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে দীপু-সহ ১০ জন হিন্দুদের (দিলীপ বর্মণ, প্রাণতোষ কর্মকার, উৎপল সরকার, মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়, রিপন সরকার, প্রতাপ, স্বাধীন, পলাশ চন্দ্র, দীপু চন্দ্র দাস) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পরোক্ষ মদতে।

দীপু হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার সামনে এসেছে একাধিক ভয়াবহ ঘটনা। ভুয়ো চাঁদাবাজির অভিযোগে রাজবাড়ির অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে হত্যা, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ডোবা থেকে কামদেব দাসের লাশ উদ্ধার, ঝিনাইদহে হাতে ধর্মীয় সুতা থাকায় গোপাল বিশ্বাস নামের এক রিকশাচালককে ভারতের 'র' এজেন্ট সন্দেহে গণধোলাই। চট্টগ্রামের রাউজানে রাতের গভীরে বাহির থেকে তালা মেরে ২ হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে অগ্নিসংযোগ, বেড়া কেটে মানুষ অক্ষত থাকলেও গবাদি পশু পুড়ে ছাই। একই কায়দায় দিনাজপুরে রাতের গভীরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৯ একর ধানের ফসলে আগুন লাগিয়ে সর্বশেষ করে দেয় মোল্লাবাদী কীটরা। দীপুর পরিবারকে একটা সেলাই মেশিন আর মাত্র ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে সরকারি সাহায্যে, এটাই দেশের কাছে সংখ্যালঘু এক জীবনের সর্বোচ্চ দাম। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার হয়তো দু'দিন আগেপিছে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে আগের মতো করে নিতে পারবে কিন্তু দীপুর পরিবারের ২১ বছরের বিধবা স্ত্রী কী স্বামীকে আর কোনোদিনও খুঁজে পাবে? শিশুকন্যা কী পাবে বাবার আদরের ছোঁয়া! বৃদ্ধপিতা কী খুঁজে পাবেন শেষ বয়সের কুঠি! বিএনপির যুবরাজ তারেক রহমানের ১৭ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন হয়েছে, অভিকে ভাষণেই তিনি সুনিশ্চিত করেছেন মদিনা সনদে তিনি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চান। তাই সর্বপ্রথম হাদি হত্যার বিচার চান এবং দলবল নিয়ে তার কবরও জিয়ারত করেছেন, কিন্তু হৃদয় কাঁপানো দীপু চন্দ্র দাস হত্যার দু'একটি শব্দও ব্যয় করলেন না। এটা দেশের হিন্দুদের জন্য উপহাস নয়তো কী! উল্লেখ্য যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানও ক্ষমতায় এসেই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি সংযোজন করেছিলেন। হাসিনাও পেয়েছিলেন 'কওমি মাতা'র সম্মান, আর হিন্দুদের কপালে আজীবন জুটলো শুধু যন্ত্রণা, দুঃখ, নির্যাতনের নির্মম গাথা। □

## শোক সংবাদ

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ অনুকূলচন্দ্র মণ্ডলের মাতৃদেবী গত ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর হয়েছিল ৯২ বছর।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলা প্রচারক তথা মালদা জেলার বিলকাঞ্চন শাখার স্বয়ংসেবক অনন্ত চৌধুরীর ভাই চন্দন চৌধুরী গত২০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৭ বছর। উল্লেখ, কর্ণাটকে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে তার মৃত্যু হয়।

* * *

সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ উত্তম রায়ের মাতৃদেবী গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

* * *

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা খণ্ড শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ সঞ্জয় কুমার দাসের কাকা মানবেন্দ্র দাস গত ২৭ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। তিনি তাঁর মা, সাত ভাই, ২ বোনকে রেখে গেছেন।


**Medmitra Bijonsikha Group**

HEALTH CARE

A-10/2, Purbadiganta, Santoshpur, Kolkata - 700 075
Mobile : +91 7980124001, E-mail : customercare@bijonsikha.com
Website : www.bijonsikha.com

Associated with manipalhospitals

**আমরা বয়স্কদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি**

- এছাড়াও আমরা বাড়িতে ডাক্তার / নার্স / ফিজিওথেরাপিস্ট / অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড়ে লিউপিন ডায়গনস্টিকস্ থেকে করিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম মেডিক্যাল যন্ত্র আমরা ভাড়ায় দিয়ে থাকি। Oxygen Concentrator | Pulse Oximeters | Walkers Suction Machine | Multi Parameter Monitors | Nebulizer Wheelchair | Hospital Beds | Air Mattresses

**আমরা বাড়িতে গিয়ে এই পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি —**
Holter | ECG | Uroflometry | ABPM | EEG | EMG | NCV | SSEP | RNS | BAER | VEP | PFT | PSG ( Sleep Apnea) | Portable Ventilator | ABPM

**আমরা মাসিক ২,৯৯৯/- টাকার বিনিময়ে CGHS কর্মচারীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি**

- মুদিখানা বাজার - মাসে একবার
- ব্যাংক থেকে টাকা তোলা - মাসে একবার
- আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালে ভর্তির সহযোগীতা
- ডাক্তারের চেম্বারে অথবা CGHS ডিসপেনসারীতে নিয়ে যাওয়া আসা - মাসে একবার
- CGHS ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে দেওয়া - মাসে একবার
- ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় সমস্ত প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষার ওপর
- **৩ মাসের অগ্রিম টাকা দিলে দু'বার বাড়িতে ডাক্তার পরিষেবা বিনামূল্যে**

# পশ্চিমবঙ্গে সুদিন আসতে কতদিন সময় লাগতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর জানলে রাজ্যবাসী অবাক হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে সুদিন আসতে মাত্র ৪ থেকে ৬ বছর লাগবে। ইতিহাস সেটাই বলে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪, কিংবা ১৯৯৮ থেকে ২০০২— এই দুই সময়ের ভারত; ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬-এর হায়দরাবাদ অথবা গত চার বছরের অসম। উন্নয়নের পথে আসীন হয়ে একটি রাজ্যে বা দেশের সুদিন ফিরতে এই সময়টুকুই কিন্তু যথেষ্ট। সিঙ্গাপুর তৈরির দশ বছর পর সেখানে গিয়ে তৎকালীন ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেন, 'ইয়ে তো দশ সাল মে কলকাত্তা বন গয়া!' তাঁর এই উক্তির কারণ হলো সেই সময়ও সবাই মনে করত যে কলকাতা হলো পৃথিবীর অন্যতম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। তাই যে কোনো উন্নত শহরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা করা হতো। সিঙ্গাপুর তৈরির সময়ও ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সুযোগ পেলে তিনি সিঙ্গাপুরকে কলকাতা বানিয়ে দেবেন। আজকের প্রজন্ম হয়তো এই বিষয়গুলি ভাবতেও পারে না। পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়ন এবং আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সরণীতে ফেরাতে বড়ো জোর ৪ থেকে ৬ বছর প্রয়োজন। এর অন্যতম কারণ হলো কলকাতার মতো ভৌগোলিক অবস্থান কারও নেই। নিউইয়র্ক, টোকিয়ো, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, হংকং, ব্যাঙ্গালোর বা মুম্বই— কারও কাছে ২০০০ কিলোমিটার জলপথ নেই। শুধু এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন খনিজ সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্র থেকে শুরু করে রেল, সড়ক, বিমানবন্দরের উন্নত পরিকাঠামো। কিছু প্রশাসনিক, আইনি এবং আর্থিক সংস্কার পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনে ম্যাজিক দেখাতে পারে।

মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, অসম, ছত্তিশগড়, বিহার, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের বিজেপি পরিচালিত সরকার ঠিক এই কাজটাই করে চলেছে। এখন ইন্দোর, ভোপাল, লক্ষ্ণৌ, রায়পুর গেলে এবং ১০ বছর আগে এই শহর অথবা এই রাজ্যগুলি কোথায় ছিল তার তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কেন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের আঞ্চলিক অফিস ভুবনেশ্বর বা গুয়াহাটিতে খুলছে সেই বিষয়ে খোঁজ নিলেও অনেক রকম ধারণা পাওয়া যায়। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে কলকাতার রাস্তাঘাটে যত উড়িয়া জল টানার লোক পাওয়া যেত, আজ কি ওই পরিমাণে তাদের দেখা যায়? সংবাদ শিরোনামে স্থান পায় কালাহান্ডি? বরং কলকাতার ছেলে-মেয়েরা ওড়িশায় পড়তে যাচ্ছে, চাকরি করতে যাচ্ছে, ব্যবসা করতে যাচ্ছে। কিছু আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের গতি বহুগুণ বাড়িতে দিতে পারে, যা ওড়িশাতে করে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। একদা বিমারু রাজ্যের অন্যতম রাজস্থানের জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, কোটার উন্নতিও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। আর এদের সবার থেকে অনেক ভালো ভৌগোলিক অবস্থান শিলিগুড়ি, মোড়গ্রাম, দুর্গাপুর, রঘুনাথপুর, খড়্গপুর বা হলদিয়ার। ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলে অন্য রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে পশ্চিমবঙ্গ, দৌড়ের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য রাজ্যগুলিকে নিজস্ব পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হয়েছে অনেক বছর ধরে, পশ্চিমবঙ্গে যা প্রায় তৈরি।

২০১১-র আগে অর্থনীতিবিদ ড. অমিত মিত্রর সাক্ষাৎকার শুনে অনেকের মনে হয়েছিল যে, ২০১৫-১৬-র মধ্যে হয়তো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বাধা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১-র নির্বাচনী ইস্তেহার। সেখানেই উন্নয়নের সব রাস্তা বন্ধ করার চাবি ছিল। ব্যোমকেশ বা ফেলুদা তাঁদের সামনে আসা কোনো সমস্যা বা রহস্য কয়েকদিনে সমাধান করতেন। নইলে বলতেন হবে না। উন্নয়নও অনেকটা তেমন ব্যাপার। হলে ৫-৬ বছরে হবে, নাহলে হবে না।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশারি কোনো রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হলে তারা ঠিক কী কী করতে পারে? উত্তর হলো, কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে যে পরিমাণ রেল, সড়ক, বন্দর, জলপথ, বিমানবন্দর, কৃষি প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, পানীয় জল প্রকল্প, নিকাশি প্রকল্প, মেট্রো প্রকল্প মঞ্জুর করেছে। রাজ্য সরকার সেই প্রকল্পগুলিকে রূপদান করলে এই সমস্ত প্রকল্প থেকে আসা জিএসটি থেকে রাজ্য সরকারের আয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। এই প্রকল্পগুলিতে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হবে, তাতে মানুষ রাজ্যে থেকে নিজেদের সংসার চালাতে পারবে। উলটে অন্য রাজ্যের লোকেরও ভিড় বাড়তে পারে এখানে।

অসমের চা বাগান যদি চালু থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানে কেন সমস্যা? ত্রিপুরার বহু সবজি ও ফল বিমানে আরব দেশে রপ্তানি হচ্ছে গত ৭-৮ বছর ধরে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ফসল রপ্তানি কেন হবে না? মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, বিমান, যুদ্ধবিমান, জাহাজ, সেমিকন্ডাক্টর চিপ, মোবাইল ফোন, ওষুধ, ইলেক্ট্রিকাল পণ্যসামগ্রী, ইলেক্ট্রিক গাড়ি, মেট্রো ইঞ্জিন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে গত ১১ বছর ধরে আমদানি কমিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে পণ্য উৎপাদন শুরু হয়েছে সারা ভারত জুড়ে। একটা তোলাবাজিহীন পরিবেশ সৃষ্টি, জমির সঠিক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ কর কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে তৈরি হবে বিরাট শিল্প সম্ভাবনা যা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করবে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে সম্পূর্ণ মার্কসবাদমুক্ত করতে হবে। কোটা বা হায়দরাবাদের মতো শিক্ষাকেন্দ্র তৈরির সেরা জায়গা উত্তরবঙ্গের যেকোনো একটি শহর। রঘুনাথপুর-দুর্গাপুর-খড়্গপুর ত্রিভুজ অথবা মোড়গ্রাম- আরামবাগ-ঘাটাল-হলদিয়া করিডোর শিল্পের হাব হতে পারে। রাজ্যের কোনো একটি বিমানবন্দরের কাছে জন হপকিন্স বা সিঙ্গাপুরের কোনো মেডিক্যাল কলেজকে জমি দিলে আন্তর্জাতিক মেডিসিন হাব হওয়ার সেরা জায়গা পশ্চিমবঙ্গ। মনে রাখতে হবে যে, ডাক্তারি, ব্যাংকিং, বিমা, শিক্ষা ও কৃষি রয়েছে বাঙ্গালির রক্তে। রাজ্যে ৮ হাজার স্কুল নতুন করে চালু করলে এবং ৬ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে সরকারি কলেজগুলিতে নিয়ে আসতে পারলে এবং সরকারি স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালে ১৫ বছরে যে পরিমাণ শূন্যপদ তৈরি হয়েছে, সেই শূন্যপদ পূরণ করলে, রাজ্যে অর্থনীতি দৌড়তে শুরু করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে রাজ্যের মানুষের হাতে আসবে অর্থ। বাজার হবে চাঙ্গা। এই মুহূর্তে সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে। আমদানি-রপ্তানি-সহ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বন্দরের সংযোগের কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তারা বিশেষ নির্ভরশীল। এই রাজ্যগুলির কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ' হলো বহির্বিশ্বের দরজা। ২০১১-র আগে ড. অমিত মিত্রর সাক্ষাৎকার শুনে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে হয়েছিল হয়তো আইজে প্যাটেল, জগদীশ ভগবতী বা অরবিন্দ পানাগড়িয়ার মতো চিন্তাভাবনা করেন উনি। কিন্তু এই রাজ্যে সবার উপর 'পিসিমণি' সত্য, তাহার উপর নাই! আর তাই সারা ভারত জুড়ে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহে এক নম্বরে পশ্চিমবঙ্গ। □

# গীতা ও বিবেকানন্দকে না জেনেই কমিউনিস্টদের মন্তব্য তাদের অসারতা ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার বহিঃপ্রকাশ

**ড. রাজলক্ষ্মী বসু**

'অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। আমাদের এখন আবশ্যক শক্তিসঞ্চার।... তোমাদের স্নায়ু সতেজ করো। আমাদের আবশ্যক— লৌহের মতো পেশী, বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেকদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও...।'— দৈহিক ও স্নায়বিক বিকাশের বিষয়টি বারে বারে অগ্রাধিকার পেয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে। দেশ গঠন থেকে আধ্যাত্মিক বোধ জাগরণ— সবকিছুর আগে প্রয়োজন দৈহিক শক্তি অর্জন।

দেশের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কেমন করে জাগ্রত হবে? মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ আর ফিদেল কাস্ত্রো আউড়ে? কোনো মতাদর্শের প্রতি বিরুদ্ধাচার না করেও বলা যায় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ যার যাই থাক, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে কিন্তু দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে না। স্বয়ং স্বামীজী বলেছেন সনাতনী উপাসনার কথা। স্বামীজী বলেছেন, দেশে কাদের আদর্শ রূপে ধরতে হবে? যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। 'দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তি পূজা চালা। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।' পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের কোনো অংশে, কোথাও কখনও কালচারাল মার্ক্সিজম এই রেফারেন্সের উল্লেখ করবে? উত্তর হলো— করবে না। স্বামীজী এও উল্লেখ করেছেন, 'এই জন্য ভারতে যে কোনো সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হোক, প্রথমত ধর্মের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে প্লাবিত করো।'

গত ৭ ডিসেম্বর সেই আধ্যাত্মিক প্লাবনের সুনামি এসেছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সমাজের উন্নতি ও স্বাধীনতার প্রথম ও শেষ পাঠ হলো বিশ্বজনীন পাঠ্যপুস্তক তথা বোধপুস্তক— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। যাদের হাজার হাজার বছর প্রাচীন ভারতের আদর্শবোধের শিকড়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাই নেই, যারা লেনিন-স্তালিন-মাওয়ে আচ্ছন্ন, তারা কোন মগজের সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের গভীরে যাবে? স্তালিনের সঙ্গে এক মগজে সহাবস্থান কি করতে পারেন স্বামীজী? যারা একই মস্তিষ্কে কমিউনিস্ট নেতা ও স্বামীজীকে ধরে রাখার ভণিতা করে, তারা সবাই কাকপণ্ডিত। ভারত জুড়ে আজ তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বসংকট উপস্থিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে। তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে, স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে তারাও বেশ পরিচিত। কিন্তু কাকপণ্ডিতদের উদ্দেশ্যই হলো আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা এবং শতাব্দী প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস। অতএব, তাদের গলা দিয়ে কা-কা আওয়াজ বেরোতে বাধ্য!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় বররুচি বলেছেন, 'কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ/ মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য/ একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা/ তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।।' অর্থাৎ ডানায় সোনা, পায়ে মণি-মাণিক্য এবং পাখায় গজমুক্তো জুড়ে দিলেও কাক কাক'ই থাকবে। এত শতাব্দী পরও 'বররুচি কথন' বড্ড প্রাসঙ্গিক। একদা কম্পিউটারের বিরোধিতা করা মার্কসবাদীদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে উঠেছে কালচারাল মার্ক্সিস্ট। আজ তারা ফেসবুক এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম হাতে পেতেই নিজেদের মুক্তমনা পণ্ডিত ভাবে। সেই মণিমাণিক্যধারী কাকেরা তুমুল আওয়াজ তোলে সামাজিক মাধ্যমে। বিভিন্ন পোস্টে এই সামাজিক মাধ্যমজীবীদের যে ধরনের একপেশে মতামত ঘনঘন চোখে পড়ে, তাতে কা-কা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তারা যে কাকপণ্ডিত এইসব ঘটনায় তা স্পষ্ট। কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ কর্মসূচির সাফল্য; কার্যক্রমটিতে অসংখ্য সনাতনীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের পরেই বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম আলোড়িত হয় কাক পণ্ডিতদের প্রতিবাদে। তাদের হাতিয়ার হলো স্বামীজীর একটি উক্তির খণ্ডিত অংশ— 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো।' এই উক্তির আগেপিছে স্বামীজীর বক্তব্য কী ছিল, কোন প্রসঙ্গে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন তা জানার বা বোঝার কোনো চেষ্টা না করেই বামপন্থী চিন্তাধারার অনুসারী এই কাক পণ্ডিতরা এই উক্তিটির অপব্যবহার করে এমন সব অপপ্রচার চালাচ্ছে যা দেখলে মনে হবে, স্বামীজীর সঙ্গে যেন গীতাপাঠের বিরোধ ছিল। এমন ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা চলছে যেন মনে হচ্ছে স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। কাক পণ্ডিতদের ভাবসাব অনুযায়ী স্বামীজী তরুণ প্রজন্মকে ফুটবলে কিক করতে বলছেন আর গীতা পড়লেই যেন ফুটবল খেলার সময় কমে যাবে। এই বিষয়টির সর্বাত্মক প্রতিবাদ প্রয়োজন। কারণ এগুলিকে কালচারাল মার্ক্সিস্ট কাকপণ্ডিতদের মসকরা বা অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী ভেবে যদি হালকাভাবে দেখা হয়, তবে তা খানিক বোকামি হবে। ভারতীয় মূল্যবোধ এবং স্বামীজীর আদর্শের পরিপন্থী হলো কালচারাল মার্ক্সিজম। ভারতের উন্নতির প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুজাতি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান উত্তরাধিকার বিস্মৃত না হয়, ততদিন জগতের কোনো শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।' বামপন্থীদের উদ্দেশ্য হলো— লেখাপড়া করা শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে, যাদের চোখে স্বপ্ন রয়েছে, জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, তাদের চোখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে একটি সাধারণ বই হিসেবে প্রতিপন্ন করা। টগবগে ছেলে-মেয়েদের দল, যারা আগামীদিনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে থাকবে, তাদের বোঝানো যে, গীতা? ও তো স্টেশন থেকে সাধারণ দোকান সর্বত্র পাওয়া যায়। যারা পুজোআচ্চা করে, ওটা তাদের জন্য। যাদের অন্ধবিশ্বাস রয়েছে, তারা ওটাকে ঝোলায় নিয়ে ঘোরে। যারা অষ্টপ্রহর কৃষ্ণনাম করে, ওটা তাদের পড়ার জিনিস। তোমরা যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যারা ঝরঝর করে ইংরেজি বলো, কথায় কথায় ইংরেজি গালিগালাজ দাও (এটা অবশ্য

ফঃ ২

তোমাদের স্ট্যাটাস সিম্বল!), তারা জন রিডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটাই পড়বে। যদিও দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ওই ১৮টি দিন বাস্তবিকই বিশ্ব কাঁপিয়েছিল। সেই দুনিয়া কাঁপানো কুরুক্ষেত্রের ১৮টি দিন লেনিন-স্তালিন- মাওয়ের বিপ্লবের সঙ্গে হয়তো ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সবরকম অপপ্রচার চালানো সেই কালচারাল মার্ক্সিস্টরাই আবার গীতাপাঠে রাজনৈতিক রং খোঁজে। স্বামীজী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গীতাপাঠের সঙ্গে ফুটবল খেলার গুরুত্বের তুলনা করে। ফুটবল খেলার প্রতি স্বামীজীর গুরুত্ব আরোপের কারণ কী? কারণ ফুটবল খেলার মাধ্যমে শরীরচর্চা হলে, দেহমন গঠন হবে এবং একমাত্র তখন তরুণ প্রজন্ম গীতার বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধিতে সক্ষম হবে। তাই শুধুমাত্র গীতা নয়, ডাস ক্যাপিটাল, কোরান, বাইবেল, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, এমনকী যে অঙ্ক, ভূগোল, পদার্থবিদ্যার বই পড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করতে হবে, সেগুলি পড়ার চেয়েও ফুটবল খেলা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশ-জাতি-ধর্মের সংকটের সময় যেকোনো বই পড়ার চেয়ে শরীরচর্চার ওপর বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটাই আর 'অপ্রয়োজনীয়' করে তুলেছে শিক্ষাজগতে ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা। যাঁরা ক্রীড়াবিদ, যাঁরা খেলাধুলা করেন, মাঠে যাঁদের ঘাম ঝরে, দেশের হয়ে পদক তাঁরাও আনেন; সাফল্য তো তাঁরাও অর্জন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এটি সুস্থ যুবসমাজ নির্মাণ যারা তেজীয়ান, বলীয়ান, যাদের থাকবে স্নায়ুর জোর, মনের জোর। পেশী ও স্নায়ুতে শক্তিবৃদ্ধি হলেই মনের জোর তৈরি হয়। তাই স্বামীজী বলেছেন, 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলে স্বর্গের কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমি যা বলব তা তোমাদের অবাক করবে। তুমি শক্তিশালী হলে তবেই গীতা বুঝতে সক্ষম হবে।'

স্বামীজীর এই বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা এমনভাবে বামমনস্ক কাক পণ্ডিতরা করছে যেন, স্বামীজী গীতাপাঠকেই সময় অপচয় বলতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী জোর দিয়ে বলতেন, 'এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা করো। তোমাদের উপনিষদ--- সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্রগুলি আবার অবলম্বন করো। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ওই সত্য সকল অবলম্বন করো, ওইগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত করো, তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।'

স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যোগ যে কতটা গভীর সেই সম্পর্কে বামমার্গীরা কতটকু জানে? গীতা ও বেদান্তের জীবাত্মা বোধ— 'নিত্য সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'-তে চিরবিশ্বাসী ভারতবর্ষ ও স্বামী বিবেকানন্দ। বামপন্থীরা কি জানে স্বামীজীর চোখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন রোল মডেল। 'নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' গীতাকে পার্সোনিফাই করেছেন শ্রীভগবান। অর্থাৎ যোগযুক্ত অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী যেন ব্যক্তিরূপে পরিগ্রহ করেছে। যখন অর্জুন পারবেন কী পারবেন না এই দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন, তখন শ্রীভগবান এই জ্ঞানপ্রদান করছেন— 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।' আত্মচিন্তনে কর্মযোগের কথা বারবার বলা হয়েছে গীতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কর্মযোগের বাণীই অমৃত কথা। তাই গীতাপাঠের দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল অন্তর্নিহিত অর্থ বোধে অবগাহন করতে হলে দেহ-মন-স্নায়ু সুস্থ, স্বাভাবিক থাকা দরকার। স্বামীজী এটাই বলতে চেয়েছেন যে, দুলে দুলে গীতা পড়লেই তা চতুর্বিধ যোগ হয় না। গীতা তুরীয় বোধ। গীতা হলো ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ, মানবধর্মশাস্ত্র। শ্রীভগবান স্বয়ং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থেকেও মধুর শান্তি লাভ করেন। আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও তিনি মহা কর্মশীল।

স্বামীজীর উপলব্ধিতে ফুটবল খেলার গুরুত্ব, বজ্রকঠিন পেশী-স্নায়ু তৈরির গুরুত্ব সর্বোপরি। কারণ সেটা তৈরি হলেই গীতার বাণীর মর্মোদ্ধার সম্ভবপর হবে। শ্রীভগবানের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা একটি সাধনার বিষয়। যে নাস্তিক তারও গীতাপাঠ করা উচিত। গিবন বা গিবসের ইতিহাস, জেভোন্সের ডিডাক্টিভ লজিক, কান্ট-স্পেন্সার-মিলের দর্শন, গডফ্রে অ্যাস্ট্রোনমি— সব ভুবন কাঁপানো তত্ত্ব ও বইপত্র। কিন্তু কোন গ্রন্থটি হলো শাশ্বত? একমাত্র চিরকালীন গ্রন্থ হলো 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। বিশ্বকল্যাণের জন্য যা কিছু সম্ভব, তাই হলো গীতা।

১৮৯৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে যখন স্বামীজী নিষ্কাম কর্ম বিষয়ে আলোচনা করছেন, তখনও তিনি গীতার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আলমবাজার মঠে শিষ্য, গুরুভ্রাতা ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বারেবারে এসেছে গীতার প্রসঙ্গ। স্বামীজী বার বার উচ্চারণ করেছেন গীতার সেই মন্ত্র— 'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।/ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।' (গীতা : ১৩/২৭-২৮) অর্থাৎ যিনি বিনাশশীল সমগ্র চরাচর ভূতসমূহের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। গীতার কর্মযোগে স্বামীজী অনুপ্রাণিত। শুভ-অশুভ উভয়েই চিরকাল থাকে পরস্পর মিশে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বাণী কালজয়ী— 'অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না। অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত, অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত।' ১৯০০ সালে সানফ্রান্সিসকোতে ভাষণ দিতে গিয়ে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের ওপর আলোকপাত করলেন স্বামীজী। সেদিনও কিন্তু কর্মযোগের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। স্বামীজী মনে করতেন, গীতা হলো উন্নততম জীবনবোধ। উচ্চস্তরের জীবন যুদ্ধ। পার্থিব জগতের তুচ্ছতার বেড়া অতিক্রম করার পাঠ হলো গীতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে উদ্দীপ্ত করেছেন। আলমবাজার মঠে বসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত চর্চার সময় স্বামীজী বলেছেন— 'গীতা উচ্চতর জীবন সংগ্রামের রূপক, তাই যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা বর্ণনার স্থান নির্ণীত হওয়ায় অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।' স্বামীজী প্রয়োগিক বেদান্তের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।' বামপন্থী কাকপণ্ডিতরা এই উক্তিটিও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ছড়িয়েছে। অর্থাৎ আবারও সেই বিকৃত ন্যারেটিভ ভাইরাল করার বিষাক্ত খেলা। ওইদিন ব্রিগেডে 'লাল সালাম কমরেড' বলতে বলতে গীতাপাঠের কার্যক্রম শেষ হলে তাকে হয়তো বলা হতো সমাজতান্ত্রিকতার জোয়ারে জনস্রোত! বামপন্থীদের ভাষ্যে, গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে জনজোয়ারটা যেন মানুষকে নীচের দিকে টানছে; অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানা দিচ্ছেই না। হাতে লাল ঝান্ডার বদলে গৈরিক পতাকা থাকলে তা যেন ঠিক ট্রেন্ডি নয়। মজার কথা হলো, আধুনিক কালের কোনো রঙের ধার ধারে না শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কোনো জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় গীতা। আলমোড়ায় দেওয়া ভাষণে ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে উল্লেখ করেন

স্বামীজী। সারা বিশ্ব আকৃষ্ট হয় এই শৈলরাজের দিকে। ভারতবর্ষকে 'ভারত জননী' হিসেবে তিনি ওই বক্তব্যে সেদিন উল্লেখ করেন। সেদিনও তিনি বেদান্ত দর্শন ও গীতার প্রাসঙ্গিকতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন এবং গীতার ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। উল্লেখযোগ্য হলো, এই আলোচনাটি স্বামীজী করেন আলমোড়ার ইংলিশ ক্লাবে। তা শুনতে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজরা। আজ যখন স্বামীজীর বেদান্ত চর্চা সংক্রান্ত আলোচনা হয়, তখন ক'জন কালচারাল মার্ক্সিস্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন? যেখানে 'পুঁজিবাদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'-এর ব্যানার দেখা যায়, কেবলমাত্র সেখানেই ঘটে কাক পণ্ডিতদের সমাবেশ। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিভিন্ন পার্টি অফিসে স্বামীজীর জন্মদিনে দেখা যায় মালা আসছে। লাল পতাকার সামনে রেড স্যালুট দেওয়া পার্টি কমরেডরা স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন। রাজনৈতিক ড্যামেজ কন্ট্রোল বলে কথা! কিন্তু যা হয়! স্বামীজীকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না করার ফল প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখে সবার চোখে পড়ে। ওইদিন 'মে দিবস' পালন করে কমিউনিস্টরা। ওই দিনটি যে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মদিবস তা কিন্তু ভুলে যায় এই বামমার্গীরা। সেই ভুলে যাওয়ার ধারাবাহিকতাতেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও স্বামীজীর বাণীর ইচ্ছেমতো অপব্যাখ্যা চলে।

যে রাশিয়া ২০১১ সালে গীতা নিষিদ্ধ করেছিল, তারাই আজ এই পবিত্র গ্রন্থকে আশ্রয় করে বাঁচার আশ্বাস পাচ্ছে। কমিউনিস্ট চীনেও গীতা জনপ্রিয়। ২০২১ সালে ওয়াং জু চেং এবং লিং হাই সিচুয়ান প্রকাশনের পক্ষ থেকে চীনা ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন এবং ভারত-চীন যোগ উৎসবে তা প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়। এক কালে লাল সন্ত্রাসের দরুন চীনা গীতানুরাগীরা গোপনে গীতাপাঠ করতে বাধ্য হলেও সাম্প্রতিক গীতা প্রকাশনার ক্ষেত্রে ওদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি আসেনি বলে সংবাদসূত্রে খবর। চীনা গবেষকরা গীতাকে 'নেক্টার অফ উইসডম্' বলেছেন। তারা বলেছেন যে, এই অশান্ত, অস্থির পৃথিবীতে যদি শাশ্বত কিছু থেকে থাকে তা হলো 'গীতা'। অধ্যাপক হ্যাং বাওসেইং গীতাকে 'স্পিরিচুয়াল এপিক' আখ্যা দিয়েছেন। ২০১৩ সালে কেরালা ডিওয়াইএফআই স্বামী বিবেকানন্দকে 'পোস্টার পার্সন' করে। 'কাস্টলেস্ সোসাইটি, সেকুলার কেরালা' গঠনের লক্ষ্যে তৈরি পোস্টারে তারা স্বামীজীর ছবি ব্যবহার করেছে। তার ৬ বছর পর ২০১৯-এ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর মূর্তির ওপর যখন বাম-অতিবাম ছাত্রদের কুৎসিত আঘাত নেমে আসে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, স্বামীজীকে রাজ্যস্তরে, রাজনৈতিক পোস্টারেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় তারা। 'দ্য পিপলস্ মিলিশিয়া : কমিউনিস্টস্ অ্যান্ড কাশ্মীরি ন্যাশনালিজম্ ইন দ্য নাইন্টিন ফর্টিস্'-এর মতো ভারত বিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বইপত্র পড়তে বামপন্থীদের অসুবিধা নেই। সব পড়া যায়। কিন্তু অনেক কিছুই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হয়। তখন সেই অপ্রাসঙ্গিকতার কালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হয়ে ওঠে আরও প্রাসঙ্গিক। কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী আজকের কাক পণ্ডিতদের মতো কখনও বলেননি যে গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়। স্বামীজীর উক্তিকে খণ্ডিত তিনি করেননি। কারণ অনেক গভীরে গিয়ে স্বামীজীকে হয়তো তিনি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠের মধ্যে দিয়েই মার্ক্সের বস্তুবাদ বোঝা যায়।

সেই বস্তুবাদ আজ যথেষ্ট অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু গীতা? ঘনান্ধকারে পথবিস্মৃত সকলের আলোর ঠিকানা হলো গীতা। কমিউনিস্টদের মতো অনেকেই গীতাকে একটি উপাসনা গ্রন্থমাত্র ভাবেন। যদিও তাতে কোনো অসুবিধে নেই। সর্বত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর সেমিনার বা আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সনাতনীদের পক্ষ থেকে বামপন্থীদের উদ্দেশে রইল বোধোদয়ের চ্যালেঞ্জ। ফেসবুক-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে স্বামীজীর আংশিক বক্তব্যের প্রচার আজ বামপন্থীদের সুবিধাবাদী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার। সম্পূর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের ওপর চর্চা ও গবেষণা হোক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো জাতির মানুষ কোনো কপিরাইট রাখেনি। এটিই গীতার মাহাত্ম্য। বেদমন্ত্রগানের স্বরলিপি হলো গীতা। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় জারিত লোকজন যার হদিশ পেতে অক্ষম। বস্তু পরিমাপ করা মাথায় এই বোধ কবে, কীভাবে আসবে? বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক বামপন্থীদের রাজনৈতিক তত্ত্ব— গীতাপাঠ হলো ভোটের প্রচার। স্বামীজীর বাণী ও রচনার অপব্যাখ্যা যারা করে, তাদের কি রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, জনপ্রিয়তা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ভোট কোনটা বাড়বে? স্বামীজী জানতেন ভারতবর্ষ হলো ধর্মের দেশ। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মপ্রাণ এক ভারতবর্ষ। তার জন্য তিনি বলেছিলেন, 'বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ শত শত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।'

বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হলো অবিনাশী। স্বামীজীর এই বোধতত্ত্বের ত্রিসীমানায় হাঁটেনি বামপন্থী কাক পণ্ডিতরা। তাদের তৈরি ন্যারেটিভ অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, পিপলস্ ওয়ার পত্রিকা, ডাস ক্যাপিটাল অথবা এগুলি থেকে কুচোকাচা, ছানাপোনা, শাখা-প্রশাখা যা কিছু তৈরি হয় তা হলো স্মার্ট বুক। গীতা হলো সেকেলে! আর সেটা প্রমাণ করতে মরিয়া কমিউনিস্টদের হাতিয়ার হলো স্বামীজীর বাণী ও রচনার বিকৃতি। সত্যি বলতে এই কমিউনিস্টরা হলো আমাদের দেশের লজ্জা! এই বামমার্গী কাক পণ্ডিতরা সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের প্রসঙ্গ খুব আনে। ১৮৯৬-এর ১৩ সেপ্টেম্বর লিও টলস্টয় অনেন্দ্র কুমার দত্তকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি স্বামীজীর রচিত বই 'রাজযোগ' পড়ে দার্শনিক উন্নতি লাভ করেছেন। বইটিতে উপস্থাপিত 'মেটাফিজিক্যাল ইনসাইটস্'গুলিকে তিনি 'অসাধারণ' বলে তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর জীবনে স্বামীজীর ছাপ ছিল গভীর। তিনি স্বীকার করেছেন যে, দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ হলো শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ। আর ভারতের বামপন্থীদের কী হাল! দেওয়াল লিখনকে তারা 'পিপলস্ জার্নাল' আখ্যা দেয়। অথচ পাড়ার দেওয়াল লিখনে তাদের আবোল তাবোল কিছু একটা লিখে দিলেই হলো, কারণ তাতে কোনো রেফারেন্স লাগে না।

ঠিক একইভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর সামাজিক মাধ্যমে তারা প্রচার করছে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য ও নানা অপব্যাখ্যা। কমিউনিস্টরা এখন কার্যত রাজনৈতিক অভিভাবকহীন। সামাজিক মাধ্যমে তাদের এইসব কার্যকলাপ নেতৃত্বহীনতার করুণ দশার প্রমাণ। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চক্রবর্তী বা বিনয় চৌধুরীর মতো কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব আজ বেঁচে নেই। তারা থাকলে হয়তো তাদের দলে এই কাক পণ্ডিতদের এতটা বাড়বাড়ন্ত হতো কী না তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে অসম্মান এবং স্বামীজীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা তাদের সংকট আরও বাড়াবে। □

# স্বাদেশিকতা, জাতীয় চেতনা ও ভারত গঠনের এক স্বপ্নের নাম স্বামী বিবেকানন্দ

**অরুণ কুমার চক্রবর্তী**

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের সূচনালগ্নে ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা, সামাজিক অবক্ষয় ও আত্মবিশ্বাসহীনতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইংরেজ শাসনের নিষ্পেষণে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সমাজে জাতিভেদ ও কুপ্রথা চরম আকার নিয়েছে, আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনেও আত্মগৌরবের অভাব। এই সময়েই আবির্ভূত হন এক বিরল ব্যক্তিত্ব— স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি কেবল একজন সন্ন্যাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রধান দার্শনিক ভিত্তিস্থাপক, স্বাদেশিকতার অগ্রদূত এবং আধুনিক ভারত গঠনের এক অনন্য স্থপতি।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয়তা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং এগুলি একত্রে ভারত পুনর্গঠনের একটি সমন্বিত রূপরেখা। তাঁর স্বাদেশিকতা সংকীর্ণ জাত্যভিমান নয়, বরং আত্মপরিচয়, আত্মশক্তি ও মানবমুক্তির বিস্তৃত দর্শন।

**স্বাদেশিকতার মৌলিক ধারণা :** স্বাদেশিকতা বলতে বিবেকানন্দ কেবল বিদেশি পণ্য বর্জন বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন বোঝাননি। তাঁর কাছে স্বাদেশিকতা অর্থ— নিজের জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গর্ব, নিজস্ব শক্তির উপর আস্থা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদা, পরাধীন মানসিকতার মুক্তি।

**ভারতীয় আত্মপরিচয়ের পুনরুদ্ধার :** ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয়দের মনে একটি গভীর হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উন্নত ও ভারতীয় সভ্যতাকে পশ্চাদপদ বলে প্রচার করা হচ্ছিল। স্বামীজী এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি পাশ্চাত্যে গিয়ে বিশ্বধর্ম সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'আমি গর্বিত যে আমি এমন এক জাতির সন্তান, যে জাতি বিশ্বের সকল ধর্মকে আশ্রয় দিয়েছে।' এই বক্তব্য শুধু ধর্মীয় নয়, গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে। তিনি ভারতকে আবার বিশ্বগুরু রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন— শুধু শক্তি নয়, জ্ঞান ও মানবতার দ্বারা।

**ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ :** স্বামীজীর ধর্মবোধ ছিল সমাজমুখী। তাঁর মতে— 'দরিদ্র নারায়ণের সেবাই প্রকৃত ধর্ম।' এই দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল ভারত গঠনের রূপরেখা। তিনি বুঝেছিলেন, নিরন্ন, নিরক্ষর ও অসুস্থ মানুষ দিয়ে শক্তিশালী জাতি গড়া যায় না। তাই তাঁর ধর্ম ছিল— মানুষের সেবা, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, চরিত্র গঠন।

**শিক্ষা ও যুবসমাজ : জাতি গঠনের চাবিকাঠি :** স্বামীজী বারবার যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলতেন— 'আমাকে শত যুবক দাও, আমি ভারতকে জাগিয়ে তুলব।' তাঁর শিক্ষাভাবনা ছিল চরিত্রনির্মাণমূলক। পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও ভারতের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি একটি নতুন শিক্ষাদর্শ প্রস্তাব করেন। এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল— আত্মবিশ্বাসী নাগরিক তৈরি, কর্মক্ষম সমাজ গঠন, জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগ। এই শিক্ষাদর্শই পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে।

**জাতিভেদের বিরোধিতা :** ভারতের দুর্বলতার মূল কারণ হিসেবে স্বামীজী সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে দায়ী করেছিলেন। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও নারীর অবমাননা— এসবকে তিনি জাতীয় পাপ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে সমাজ নিজ সমাজের মানুষকে মানুষ বলে মানে না, তার স্বাধীনতা অর্থহীন।'

**অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা ও স্বদেশী চেতনা :** স্বামীজী বিশ্বাস করতেন— ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতা জাতির সর্বনাশ করে। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা জরুরি। গ্রামীণ সমাজের পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য। এই চিন্তাধারাই পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের দর্শনে প্রতিফলিত হয়।

**বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারতের রূপকাররা :** গান্ধীজী, নেতাজী, অরবিন্দ ঘোষ— সকলেই বিবেকানন্দকে তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্বীকার করেছেন। নেতাজী বলেছিলেন— 'বিবেকানন্দই আধুনিক ভারতের নির্মাতা।' এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে স্বামীজীর স্বাদেশিকতা শুধু ভাববাদী দর্শন নয়, তা ছিল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নির্মাণের শক্তিশালী আদর্শগত ভিত্তি।

**বিশ্বমানবতা ও ভারতের ভূমিকা :** স্বামীজীর ভারত গড়ার লক্ষ্য কখনো সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক ভারত— যে নিজের আত্মাকে চেনে, কিন্তু অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে— হিংসা নয়, সহমর্মিতার মাধ্যমে। তাঁর ছিল আত্মজাগরণের দর্শন। তাঁর ভারত গড়ার লক্ষ্য ছিল— আত্মবিশ্বাসী নাগরিক, সাম্যভিত্তিক সমাজ, জ্ঞান ও মানবতানির্ভর রাষ্ট্র।

তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, ভারত গড়া মানে কেবল দেশ গড়া নয়; মানুষ গড়া। যতদিন ভারতীয়রা নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস রাখবে, ততদিন স্বামীজী জীবিত থাকবেন জাতির চেতনায়। □

# সেকুলার গান! বাঙ্গালি হিন্দুর সাবধান হওয়া উচিত

**পারমিতা গুপ্ত**

সম্প্রতি সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘটে গেল এক লজ্জাজনক ঘটনা। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের সংগীতমহলে আলোড়ন ফেলেছে। শিল্পী 'দেবী চৌধুরাণী' ছবির 'জাগো মা' গানটি পরিবেশন করছিলেন, তখন তাকে আক্রমণাত্মকভাবে বাধা দেওয়া হয়। বলা হয়, 'অনেক জাগো মা' হয়েছে। এবার একটু সেকুলার গান গা। এটি বলেন মেহেবুব মালিক নামের এক ব্যক্তি। ফেসবুকে প্রায় একইরকম অভিযোগ করছেন শিল্পী মধুবন্তী মুখার্জি। তাকে নাকি বলাও হয়েছে যে ধর্মীয় গান করা যাবে না। সেকুলার গান করতে হবে। সেকুলার গান! ভাবুন একবার, এইরকম দাবি উঠতে থাকলে তো কীর্তন গাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ভজন গাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, আগমনী, শ্যামাসংগীত সব বাদ হয়ে যাবে, অর্ধেক লোকসংগীতকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। আধুনিক বাংলা গানের পরিধিও বেশ খানিকটা ছোটো হয়ে আসবে। এসব গেলে বাংলা গানের আর থাকবেটা কী? কোনদিকে যাচ্ছে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ? রাজ্যের সংগীতভাণ্ডারকে সংকুচিত করার এই প্রয়াস অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনোভাবেই এই দাবি সমর্থনযোগ্য নয়। শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য এবং তাকে অপমান করার জন্য শিল্পীদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। সেটা খুবই স্বাভাবিক।

তবে বিষয়টি বোধহয় আরও গভীর। মনে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে ঠিক এইরকমভাবেই একটি গানকে সাম্প্রদায়িক গানের তকমা দেওয়া হয়েছিল এবং গাইতে অস্বীকার করা হয়েছিল কারণ সেই গানের মধ্যে একটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।'

এটি বন্দেমাতরমের অংশ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম্'-এ 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' কথাটি থাকার জন্য গানটি গাইতে অস্বীকার করে মুসলমানরা। পরের ঘটনা সকলেরই জানা। বন্দে মাতরম্ তো খণ্ডিত হলোই, শেষে দেশটাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। আজ বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে এসে আবার সেই অপ্রিয় ঘটনার ঝলক দেখা যাচ্ছে। কাকতালীয়ভাবে এখানেও ঋষি বঙ্কিমের উপস্থিতি। 'জাগো মা' গানটি যে সিনেমার সেই 'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্রেরই একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। আবার সিঁদুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে, তাই এবার অন্তত সাবধান হওয়া উচিত।

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে এধরনের বক্তব্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে জেহাদি মানসিকতা ও তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের জন্যই মালদা-মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের অত্যাচারিত হয়ে গৃহছাড়া হতে হয়েছে; হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে হিন্দু হওয়ার অপরাধে প্রাণ দিতে হয়েছে; পহেলগাঁওয়ে হিন্দু পর্যটকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে মেরে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কিছু কিছু স্কুলে সরস্বতী পূজা করতে বাধা দেওয়া হয় বলে শোনা যায়

আর সম্প্রতি এক খ্যাতনামা শিল্পীকে গান গাইতে বাধা দেওয়া হলো। পরিস্থিতি যথেষ্ট গম্ভীর। উদ্বেগের বিষয় এটাই যে, এগুলি ক্রমাগত ঘটে চলেছে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে। চিন্তার কারণ, এটা পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে নয়, তাও এই ধরনের কথা শুনতে হচ্ছে। বাঙ্গালি হিন্দুদের কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন উঠবে, বাঙ্গালি হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয় কেন? কারণ বাঙ্গালি হিন্দুদের এই একজোট হওয়ার পথে প্রধান বাধা হিসেবে নিবিষ্টচিত্তে কাজ করে গেছে পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার প্রজাতি। এখনও এরা সমানভাবে সক্রিয়। সেকুলারিজমের নাম করে আবেগপূর্ণ অবাস্তব কিছু ন্যারেটিভের মাধ্যমে হিন্দু বাঙ্গালির একাংশকে এরা দিনের পর দিন প্রভাবিত করেছে এবং হিন্দুদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এরা মুখে নিজেদের সেকুলার বলে অথচ দেখা যায় কেবল হিন্দুধর্মকে নানাভাবে হেনস্থা করে থাকে। হিন্দু সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করাই তাদের উদ্দেশ্য। হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেই তারা অনাবিল আনন্দ পায়। তারা প্রকাশ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে গোমাংস খায় কিন্তু প্রকাশ্যে শুয়োরের মাংস খাওয়ার সাহস দেখাতে পারে না। তারা হিন্দুধর্মের রীতি নীতি মানতে খুব বিরুক্তি বোধ করে কিন্তু ইফতার পার্টিতে গিয়ে কবজি ডুবিয়ে কী জানি কী খেয়ে আসে। নাগা সন্ন্যাসীদের তারা অশ্লীলতার প্রতীক মনে করে কিন্তু স্বল্পবসনা দেহপ্রদর্শনকারী নারীদের সাহসী বলে আখ্যায়িত করে। তারা গোমূত্র নিয়ে হাসাহাসি করে যা ঔষধি গুণসম্পন্ন, অথচ লিভার খারাপ হবে জেনেও অনেকে নিয়মিত মদ্যপান করে থাকে। হিন্দু দেব-দেবীদের সম্পর্কে তারা বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করে থাকে, কিন্তু মুসলমান, খ্রিস্টানদের নিয়ে এধরনের কথাবার্তা বলার ধৃষ্টতা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। শুধু হিন্দুধর্ম বা দেব-দেবীই নয় বাঙ্গালি হয়ে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজীর সম্বন্ধে কটূক্তি করতেও এরা ছাড়েনি। এরকম আরও অজস্র কীর্তি এদের আছে যা নিয়ে লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, এদের অধিকাংশের পুর্বপুরুষ দেশভাগের আগে-পরে সর্বস্ব ছেড়ে, প্রাণ হাতে করে একবস্ত্রে এদেশে চলে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও এরা যাদের জন্য দেশছাড়া হতে হয়েছিল তাদের জেহাদি কাজকর্মে ও মানসিকতায় কোনো দোষই দেখতে পায় না। শুধুই তাদের গুণগান করে। এরা নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক বলে দাবি করে কিন্তু সেই ছেচল্লিশ সাল থেকে হিন্দু নিধনের অজস্র ঘটনা দুই বঙ্গ ঘটে চলেছে তবুও থিয়োরিটা তারা কিছুতেই মানতে তায় না। এরা গবেষণার বিষয়বস্তু। এরকম অজস্র সেকুলার সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা সমস্ত সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। এতদিন ধরে শিক্ষা, সাহিত্য চিত্রকলা, নাটক, সিনেমা, সবকিছুর মাধ্যমে হিন্দুবিরোধী ন্যারেটিভ তৈরি করে প্রচার করেছে, হিন্দুদের নিজেদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস করেছে, তাদের অস্তিত্বসংকটে ভুগতে বাধ্য করেছে। সেকুলারিজমের আড়ালে নির্লজ্জভাবে মুসলমান তোষণ করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছে। এদের কার্যকলাপে সেকুলার শব্দের মানেটাই বদলে গেছে। এখানে সেকুলার মানে দাঁড়িয়েছে হিন্দু বিরোধী। তাই সেকুলার গান ব্যাপারটি আদৌ হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

একটা নজরুলগীতি আছে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। সময় বদলাচ্ছে। হিন্দুরা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, তারা নিজেদের শিকড়ে ফিরছে, ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হচ্ছে। এরাজ্যের হিন্দুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। ইন্টারনেটের যুগে কোনোকিছুই চাপা থাকে না। এক ক্লিকেই বাঙ্গালি মরিচঝাঁপির ঘটনা জানতে পারছে, বিজন সেতুর ঘটনা জানতে পারছে, যোগেন মণ্ডলের অপকীর্তি জানতে পারছে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাও জানছে, দেখছে, শুনছে। বাঙ্গালি হিন্দু আজ বুঝতে পারছে কোনটা ভুল। কী ভালো আর কী মন্দ, কে অনিষ্টকারী আর কেউ বা হিতাকাঙ্ক্ষী। আগের থেকে তারা এখন অনেক সাবধানী। সাবধান তো হতেই হবে। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে, পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে হলে, অতীতকে জেনে বর্তমানকে দেখে নিশ্চিন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য হিন্দুদের একজোট হয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতেই হিন্দুর মঙ্গল।

## ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকা পত্রিকার ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায় ড. কল্যাণ চক্রবর্তী লিখিত 'নিম্বার্ক দর্শনে অহিংসা এবং ধর্মরক্ষার অনুসন্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীর পরিবর্তে ভুলক্রমে শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের ছবি ছাপানো হয়েছে। এক্ষণে শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীর ছবি উপস্থাপিত হলো।

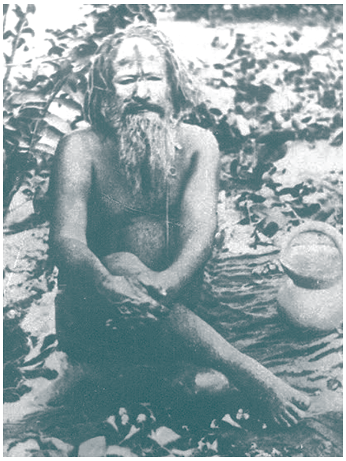

# ওরা আজও কেন হিন্দু নিধনকারী বাবরকে চায়?

**বটু কৃষ্ণ হালদার**

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির শেষবার পুনর্নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১ হাজার থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতানুসারে। ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লি দখল করে। এরপর মুসলমান শাসকদের যে চিরাচরিত প্রথা, ক্ষমতা দখল করেই ইসলামের ঝান্ডা উড়ানো এবং অমুসলমানদের উপাসনাকেন্দ্র ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে মসজিদ বানানো বা তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা, বাবর সেদিকে নজর দেয়। এজন্য বাবরের নির্দেশে তার সেনাপতি মীর বাকি খাঁ, ১৫২৭/২৮ সালে অযোধ্যা আক্রমণ করে প্রথমে কিছু হিন্দুকে হত্যা করে এবং বাকিদের বন্দি করে। এরপর ভারতের প্রধান শ্রীরামমন্দির, যা শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যাতেই অবস্থিত, সেটার উপরের অংশ ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরের মূল ভিত্তির উপরেই মসজিদ তৈরি করে, যেটা বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত। এই মসজিদ তৈরি করার সময় যেসব হিন্দুদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাদের গলা কেটে প্রথমে একটি পাত্রে সেই রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

তারপর জলের পরিবর্তে চুন-সুড়কির সঙ্গে সেই রক্ত মিশিয়ে মন্দিরের মূল ভিতের উপরই ইটের পর ইট গেঁথে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাই ইসলামি প্রথাসম্মত মসজিদ এটা নয়, ইসলামের বিজয় অভিযানে হিন্দুদের মনোবল ভাঙতে যত্রতত্র অসংখ্য মন্দির ভেঙে যেমন বিজয় স্মারক নির্মিত হয়েছিল, বাবরি মসজিদও তেমনি বাবরের একটা বিজয় স্মারক। একইভাবে বাবর সম্বল ও চান্দেরীর মন্দির ভেঙে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে এবং গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করে। বাবর যে রামমন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছে, এর ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো, বাবরের আমলেই হিন্দুরা ২১ বার লড়াই করেছিল মন্দির উদ্ধারের জন্য। বাবর যদি মন্দির না ভেঙে পৃথক এক জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করতো, তাহলে কি হিন্দুরা বাবর নির্মিত মসজিদকে ভেঙে দিয়ে সেখানে মন্দির স্থাপন করার জন্য ২১ বার লড়াই করার মতো দুঃসাহস দেখাতো? আর এরকম দুঃসাহস দেখালে বাবর কি হিন্দুদের অস্তিত্ব তার শাসনাধীন এলাকায় রাখতো? এরপর হুমায়ুনের রাজত্বকালে ১০ বার এবং আকবরের রাজত্বকালে ২০ বার হিন্দুরা শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির উদ্ধারের জন্য লড়াই করে। শেষে আকবর একটি আপোশ নিষ্পত্তি করে মসজিদের পাশেই শ্রীরামমন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় এবং ছোটো একটি মন্দির নির্মিত হয়। এসব উল্লেখ আছে আকবরের শাসনকালের ইতিহাস 'আইন-ই-আকবরি'তে। ওখানে মন্দির যদি না থাকতো তাহলে, হিন্দুরা এতবার লড়াই কেন করলো, কেন এইসব লড়াইয়ের ইতিহাস মুঘল ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হলো আর কেনই-বা আকবর একটি আপোশ সীমাংসা করে মন্দির নির্মাণে অনুমতি দিল?

আকবর মন্দির নির্মাণে অনুমতি দেওয়ায় এবং মসজিদের পাশে একটি মন্দির নির্মিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর এবং শাজাহানের আমলে এ নিয়ে কোনো লড়াই সংগ্রাম হয়নি। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সেটা সহ্য হলো না। সে একটি বাহিনী পাঠায় ওই মন্দির ধ্বংস করার জন্য। ১০ হাজার লোক নিয়ে বৈষ্ণব দাস মহারাজ নামে এক সাধু ঔরঙ্গজেবের এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করে, ফলে সেইবার মন্দির রক্ষা পায়। এরপর আরও কয়েকবার ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংসের জন্য তার বাহিনী পাঠায়, কিন্তু প্রতিবারই হিন্দু এবং শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখরা মিলে মন্দিরকে রক্ষা করে বা দখলকৃত মন্দিরকে আবার উদ্ধার করে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব দমবার পাত্র ছিল না। মুঘল সৈন্যরা রমজান মাসের একটি দিনে হঠাৎ আক্রমণ করে আকবররের সময়ে মসজিদের পাশে নির্মিত হওয়া ওই রামমন্দিরকে ভেঙে ফেলে এবং হিন্দুরা বাধা দিতে এলে প্রায় ১০ হাজার হিন্দুকে হত্যা করে। মুঘলদের আরেক ইতিহাসের বই আলমগিরনামায় এই ঘটনার উল্লেখ

আছে। এরপর ১৮৫৭ সালে মহা-বিদ্রোহের সময় হনুমান গড়ির মোহন্ত উদ্ধব দাস অস্ত্র হাতে নিয়ে রাম জন্মভূমিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সেই সময় অযোধ্যার নবাব ফরমান আলির মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে হিন্দুদের যুদ্ধ হয়।

শেষে নবাব একটি ফরমান জারি করে একটি প্রাচীর ঘেরা জায়গায় মন্দির নির্মাণ ও পূজা উপাসনার অনুমতি দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটায় এবং হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যরা মিলিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহে অংশ নেয়। মূলত নবাব এই আপোশ করতে বাধ্য হয়েছিল মহা বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের একত্রিত করার স্বার্থে। কিন্তু মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলে এইসব কিছুই জলে যায়। ইংরেজরা শ্রীরাম জন্মভূমির একটি তেঁতুল গাছে অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারে এবং নবাবের ফরমান ইংরেজরা ওই তেঁতুল গাছটিকেও সমূলে উপড়ে ফেলে। এরপর ১৯১২ সালে হিন্দুরা নির্মোহী আখড়ার সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বহু প্রাণের বিনিময়ে শ্রীরামজন্মভূমির একাংশ উদ্ধার করে এবং বাকি অংশ উদ্ধারের জন্য লড়াই হয় ১৯৩৪ সালে।

এরপরই ইংরেজরা অযোধ্যায় ওই স্থানে হিন্দু মুসলমান সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সেই থেকেই বাবরি মসজিদে কেউ নমাজ পড়েনি। ফৈজাবাদ কালেক্টরির রেকর্ডে লিপিবদ্ধ আছে এসব ইতিহাস। ভাঙার সময় বাবরি মসজিদ ছিল যে একটি পরিত্যক্ত মসজিদ, তা জঙ্গল ও গাছপালায় ভরা এবং ক্ষয়ে যাওয়া মসজিদের দেওয়ালের ছবি দেখে তা সহজেই বোঝা যায়।

১৫২৭ সাল থেকে হিন্দুরা রামমন্দির উদ্ধারের জন্য লড়াই করেছে বা চেষ্টা করেছে, ছোটো বড়ো মিলিয়ে মোটামুটি ৭৬ বার। ৭৭তম বারের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুরা দখল, রূপান্তর ও অসহিষ্ণুতার প্রতীক বাবরি মসজিদকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। কিন্তু এই শেষ বারের প্রচেষ্টাও ছিল প্রায় সোয়া ২ বছরের। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে হিন্দুরা প্রথম ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সালে জলসংকল্প দিবস পালন করে। এরপর বহু জেল জরিমানা, হুমকি ধমকিকে অগ্রাহ্য করে কিছু প্রাণের বিনিময়ে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে ভেঙে ফেলে বাবরি মসজিদ। তাই এই ৬ ডিসেম্বর দিনকে হিন্দুরা শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসেবে মান্যতা শুরু করে।

যারা এযাবৎ ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে বাবরি মসজিদ নিয়ে ভেঙে ফেলার ঘটনা নিয়ে মিথ্যা নাটক করে, মুসলমান ভোট টানার জন্য রাজনীতির ইস্যু বানায়, তাদের বহু তথ্য প্রমাণ-সহ এমন ইতিহাস মন দিয়ে পড়া উচিত। সেই সঙ্গে ভাবনার বিষয় হলো, তারা কোনোদিন প্রশ্নটুকুও তোলেনি, এই অত্যাচারী ও বর্বর জাতিগুলো শিল্পী ও সৌন্দর্যপিপাসু হলো কী করে? কবে থেকে? ভারতের মাটিতে পৌঁছেই তারা হঠাৎ আর্কিটেক্ট হয়ে উঠেছিল, এটা ভারতের মাটির গুণে? নাকি বামপন্থী ঐতিহাসিকদের দাবার চাল সাজানোর গুণে? একবারও কি ভারতের মানুষের মনে হয়নি, এরা এদেশে লুঠ করতে এসেছিল নাকি শিল্পসৃষ্টি করতে? কী দরকার ছিল কুতুবউদ্দিন আইবকের এদেশে কুতুব মিনার বানাবার?

তবে মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে হিন্দুর ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার এই খেলা অনেক পুরোনো। বিগত ৮৫০ বছর ধরেই হিন্দুদের ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। স্বাধীনতার পর বামপন্থী ও কংগ্রেসিরা একে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রয়োগের কথা ভেবেছে। এর নাম দিয়েছে 'কালচারাল মার্কসবাদ'। ভারতের ইতিহাস থেকে বেছে বেছে বাদ দেওয়া হয়েছে রাজা অনঙ্গ সিংহ, রাজা জয় সিংহ, পাঞ্চাল রাজ আদিত্য মোহন, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল, রাজা পরমার্থী দেব বর্মণ, রাজা বিজয় সিংহ, রাজা সর্বথাসিদ্ধ কৌশল, রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, রাজা অজাতশত্রু, রাজা সূসীমান গৌড় প্রভৃতিদের। আর তাঁদের রাজত্বে প্রকাশিত সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পসুষমাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তুঘলক, ঘোরি, আইবক, শক, হুন, পাঠান, মোগলদের মতো বেদুইনের মাঝে। যাদের কাছে অত্যাচার, মাথাকাটা, গলাকাটাটাই ছিল একমাত্র শিল্প। এক্ষেত্রে বেছে বেছে শুধু হিন্দুদের ইতিহাসকে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু সেকুলারবাদী মানুষজন রাজনীতির স্বার্থে যখন হিন্দুদের প্রাচীন শিল্পকলাগুলোকে বেছে বেছে মুসলমানদের মাঝে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছে, তার মাঝে চুন সুরকি খসে পড়ে প্রকৃত ইতিহাস সামনে আসছে। আগামী ভবিষ্যতে এমন শিল্পকলাগুলোর প্রকৃত ইতিহাস সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশবাসীদের সর্বদা তাদের স্মরণ করা উচিত যাঁরা বিপ্লবীরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে এই ভারতবর্ষের মন্দির, মসজিদ বানানোর অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ স্বাধীনতা লাভের পর সেসব ইতিহাস ভুলে গিয়ে সাড়ে আটশো বছর আগে রাজত্ব করে যাওয়া লুটেরা হিন্দু নিধনকারী বাবরকে তাদের অন্তরে এক শ্রেণীর লোকজন জায়গা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু কেন? এভাবে স্বাধীনতার ইতিহাসকে পদদলিত করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে সমর্থন করার নাম হলো দেশদ্রোহিতা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশদ্রোহীদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড কিন্তু এই ভারতবর্ষে দেশদ্রোহীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। দেশদ্রোহীদের যে অর্থ দান করা হয় তা হলো জনগণের টাকা। কেন এইভাবে জনগণের অর্থ অপচয় করা হচ্ছে? এভাবে চলতে থাকলে ভারতবর্ষ লুটেরা ও দেশদ্রোহীদের হাতে চলে যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস মুছে দেওয়া হবে। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। □

# স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনা

**ছবিলাল পাল**

ভারতের ইতিহাসে এক সংকটময় মুহূর্তে দেশকে উচ্চাসনে বসিয়ে ছিলেন নবযুগের পথপ্রদর্শক বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর চিন্তাভাবনা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং হৃদয়জাত ঐকান্তিক অনুভূতি। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক সামাজিক পরিবর্তন, যেখানে সমগ্র মানব জাতি তার নিজস্ব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উৎকর্ষ, উন্নতি নিশ্চিত করবে। তিনি মনে করতেন প্রতিটি মানুষ মূল্যবান, কেউ অবহেলার পাত্র নয়। সকলেই অসীম কর্মশক্তি ও অনন্ত সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। মানবজাতির গুণগত মান ও বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে তাঁর অন্তর্নিহিত ইচ্ছা শক্তিকে চিনতে হবে। সর্বাঙ্গসুন্দর মানবিক সমাজ গঠনের জন্য তিনি সমাজ ভাবনার কথা বলেছেন।

**পশ্চাদপদ ভারতের পুনরুদ্ধার :** মানুষের জীবনবোধ ও আচার আচরণ এবং চিন্তা ভাবনার ও নৈতিক চেতনার স্তর নিম্নমুখী, এর থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। প্রতিটি মানুষকে উদার, বিনয়ী, প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য মনের অধিকারী হতে হবে। ভবিষ্যতে সকলকেই বাসনা ভুলে বড়ো লোক না হয়ে বড়ো মনের মানুষ হতে হবে।

**অশিক্ষা দূরীকরণ :** সমাজের সার্বিক বিকাশ ঘটাতে হলে চাই শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষকে নির্ভীক এবং মানুষের মঙ্গল সাধন করবে এবং সক্ষমতা আনবে। তিনি বলেছেন নিরক্ষরতা দোষ নয়, কিন্তু শিক্ষায় অনিচ্ছাই দোষের মূল কারণ। শিক্ষাকে সকলের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে এবং তা হবে সর্বজনীন, অন্তিম স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ।

**নিম্নবর্গের শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক যত্নবান হওয়া :** সমাজে যারা শিক্ষার আলো পায়নি, সেই সকল শ্রেণীকে শিক্ষাদানের জন্য স্বামীজী প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেছেন। দরিদ্রের কুটিরে রয়েছে জাতীয় জীবন। এরা একটু চেতনা পেলে দেশের সমৃদ্ধি অবশ্যই আসতে বাধ্য। বলবান অপেক্ষা দুর্বল মানুষকে অধিক সুবিধা প্রদান করবে শাসন ব্যবস্থা। সম্প্রতি এক শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠী স্বামীজীকে সমাজের একটি বিরাট অংশের দৃষ্টির আড়ালে রেখে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে এগোলেও স্বামীজীর অন্তরাত্মা তৃপ্ত, কারণ আজ উচ্চ মেধাসম্পন্ন দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা পঠন-পাঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

**নারী শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব :** স্বামীজীর নিকট নারীজাতি পণ্য নয়, প্রেরণা। নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর ছিল অনন্ত উৎসাহ। পুরুষ শাসিত সমাজকে তিনি হুঁশিয়ার করেছেন নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়, ওদের অবহেলা করবে না। তাঁর ধারণায়, যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হয় তাঁদের ঘরে বড়ো মানুষ জন্মায়। শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতিকে বাঁচাতে হবে, তাহলেই দেশের কল্যাণ।

**জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত করে তোলার শিক্ষা :** শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা না দিয়ে, বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা তিনি বলেছেন। মানুষ গড়া ও চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাক্, চিন্তা ও কর্মের শুদ্ধতাই হলো প্রধান শিক্ষা। তিনি বলেছেন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাঁর বিবেক। যে সব ছেলে মন দিয়ে পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম হয় তাঁদের তিনি 'ভালো ছেলে' মনে করতেন না। কারণ এরকম ছেলেরা ডিগ্রি অর্জন করে, জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। কৌতূহলী মন ছাড়া প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব নয়।

**মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও চেতনাস্তরের বিকাশ :** Every Man is Potentially Divine প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত চেতনাশক্তি আছে, আন্তরিক সাধনার দ্বারা তার গুণগতমানের বিকাশ ঘটাতে হবে। সাধারণ থেকে অসাধারণ মানবসম্পদ হতে গেলে, চাই অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় ও লোভহীন ঐকান্তিক ধারাবাহিক অনুশীলন। মান আর হুশ এই আত্মজ্ঞান সকলের মধ্যে থাকা উচিত। মুখ ও মনের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

**নারী-পুরুষের সামাজিক সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা :** পুরুষের ভোগের সম্পত্তি হিসেবে নারী যেন অপমানিত না হয়। একটি পাখির দুটি ডানা নারী পুরুষ, একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের সমান সম্মান দেওয়া উচিত। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দিতে হবে। নারী লোক সমাজে পণ্য নয়, প্রেরণা। নারীকে প্রাপ্য মর্যাদা দিলে দেবতারা খুশি হন। সংসার সুন্দর হয় রমণীর গুণে। স্বামীজীর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর

ফঃ ৩

সহধর্মিণী মা সারদার শ্রীচরণে ফুল দিয়ে পূজা করে সারা বিশ্বের নারীকে প্রতীকী সম্মান অর্পণ করেছিলেন।

**দিশাহীন, কর্মহীন ও নীতিহীন যুব সমাজের মানসিক বিকাশ :** যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই সমাজের মৌলিক আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করবো যার দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। তিনি বলেছিলেন মানুষ যেন নিজেকে অসহায় ও ঘৃণাবোধ না মনে করেন। ঘৃণা করলেই তার অধঃপতন নিশ্চিত। উন্নতি ও উৎকর্ষতার জন্য প্রথমেই নিজের উপর বিশ্বাস জরুরি। যুব শক্তিকে তিনি শিবশক্তিরূপে মানতেন। এদের উৎসাহ, উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি যে কোনো গঠনমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্ত।

**বিভেদ থেকে মুক্তির পথ :** বিভেদ একটি ধ্বংসকারী পথ। যেটা সমাজের পক্ষে অবশ্যই অহিতকর। ধর্মের নামে শোষণ ও সংঘাত নয়। ভারতের প্রাণের ধ্বনি হলো সংহতি ও আত্মীকরণের ইতিহাস। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী আপামর মহামানবের মহামিলন ঘটিয়েছিলেন। যার চালিকা শক্তি হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্মচেতনাই ছিল তার কাছে আধ্যাত্মিক ও আত্মার বিজ্ঞান।

**সঙ্ঘ গঠন ও তার প্রয়োজনীয়তা :** যে কোনো ব্যক্তি ও সমষ্টির সমমনা আন্তরিক সদিচ্ছা প্রয়োগেই নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রূপায়ণ পরিকল্পনা সম্ভব। বিরল দৃষ্টান্ত ১৮৯৮ সালে তৈরি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। প্রতিটি সঙ্ঘের যেন মৌলিক মানবিক সুনির্দিষ্ট সঠিক লক্ষ্য থাকে, আদর্শহীন সঙ্ঘ যেন না হয়, লোকনীতি ও মহান উদ্দেশ্যের দ্বারা নিরপেক্ষ অরাজনৈতিকভাবে সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে পরিচালিত।

**জাত্যভিমান বোধের প্রকাশ :** ভারতবর্ষ বহুজাতিক মহামিলনের একটি সনাতনী ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থক্ষেত্র। দীন হলেও হীন কিন্তু নয়। স্বামীজী বলতেন দেশকে নিয়ে ব্যঙ্গ পরিহাস মানবো না, কারণ এটা নিজের মা-কে অপমান করার, কোনো সন্তান কি তা মেনে নিতে পারে? আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন— দেশের জল হাওয়াতে লালিত পালিত হয়ে যে সব মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, অধিক অর্থের লোভে দেশমাতৃকাকে বঞ্চিত করে, তার মেধাকে বিক্রয় করে বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অনাবাসীর পরিচয় দেন, সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে আত্ম বিলাসে অবগাহন করেন তাদের বলি দেশদ্রোহী।

**সাধারণ মানুষকে অবহেলা নয় :** দেশের সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা ও অবহেলা আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ। নতুন ভারত গড়ে উঠবে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, সাফাইওয়ালা ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্য থেকে। যদি ঈশ্বরের দর্শন পেতে চাও, হত দরিদ্রের কুটিরে যাও। যদি ঈশ্বর লাভ করতে চাও, তাহলে তুমি দরিদ্র, দুঃখী, নিপীড়িত, পদদলিত, শোষিত, অবহেলিত ও অসহায় নর নারায়ণের সাধ্যমতো সেবা কর। নিজের জন্য যা কর, তাই ধর্ম নয়। শিব জ্ঞানে জীব সেবা এই মমত্ববোধ অবশ্যই থাকা উচিত।

**উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি :** সকল মানুষের কর্মে দক্ষতা নেই। সৃজনশীলতার বিচারে একজন শিক্ষকের সমাজে যেমন গুরুত্ব তেমনি বাড়ির কাজের লোকের গুরুত্ব কর্মদক্ষতার জন্য সমান। কর্মক্ষেত্রে ও সর্বক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে সম্পাদন করতে হবে। কোনো রকম একটা চাকুরি জুটিয়ে নিলাম, কর্তব্য শেষ, এটা যেন না হয়। স্বামীজী বলেছেন— আমরা বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে দিয়ে হা-অন্ন হা-অন্ন করতে থাকি।

**গভীর ও আন্তরিক বিশ্লেষণ :** সমাজের প্রতিটি মৌলিক বিষয় ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভাবতে হবে। মুখে যা বলবো মনেপ্রাণে তা যেন মেনে চলার চেষ্টা করি। যে কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে হবে, অসহায় হয়ে কূপমণ্ডুক হলে চলবে না। যারা অতীব মেধাবী তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করুক, আর অন্যরা বহুমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছড়িয়ে পড়ুক। সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ ডিগ্রি না বাড়িয়ে সময় থেকে কর্মমুখী স্বনির্ভরতার সন্ধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। এ দেশের পিতা-মাতারা চায় তারা যদি শিক্ষক বা অন্য পেশার মানুষ হয়, যেন তেন প্রকারেণ তাদের সন্তানরাও যেন তাই হয়। বিদেশে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যাপকের ছেলে চাকরি না পেয়ে রঙের মিস্ত্রি হলে সেটা গর্ব করে অন্য জনকে বলে। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশচাত্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

**পরিশ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটাতে হবে :** স্বামীজী বলেছেন— মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, নিজেকে দেশের ও বৃহত্তর মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে না করেন, জীবিকা অর্জন ছাড়া, সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে সচেতন না হয় তাহলে শিক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

**আত্মবোধ ও আত্মনির্ভরশীল ভাব প্রণয়ন :** মানুষ যেন পরনির্ভরশীল না হয়। রুটিন মাফিক গঠনমূলক সহভাগী পরিকল্পনার মাধ্যমে সে নিজে নিজেকে সাহায্য করবে আত্মপ্রগতির জন্য। অনুদান নির্ভর থেকে সকল সাধারণ নাগরিক সচেতন থাকতে হবে, নচেৎ ইচ্ছা শক্তি নষ্ট হয়ে চরম অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে উদ্যম কর্মশক্তি হারাবে।

**সর্বজনীন শিক্ষা অনুশীলন :** শিক্ষিত হয়ে মানুষ যদি অসৎ হয়, তাহলে শিক্ষা তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। নামমাত্র কতগুলি ডিগ্রি ভার বহন করে চলেছি। প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের চরিত্রে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই স্বামীজী বলেছেন, 'মস্তিষ্কে শুধুমাত্র তথ্যের ভিড় জমালেই মানুষ শিক্ষিত হয় না। মূল কথা হলো সংস্কার ও চরিত্র গঠন, খাঁটি মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা। বহুমুখী শুভ চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করা। যা মানুষকে লৌহপেশী ইস্পাতের মতো দৃঢ়তা এবং প্রবল অপরিসীম মানসিক শক্তি দেবে।' □

# ক্যানসারের কারণ ও প্রতিরোধ

**ডাঃ বলরাম পাল**

ল্যাটিন শব্দ 'ক্যানসার' থেকে উৎপন্ন হয়েছে একটি Esperanto word-'Kankro'; যেটা বাংলায় হয়েছে কাঁকড়া, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে কর্কটরোগ, আবার গ্রিক ভাষায় karkinos, যার অর্থ crab। এই karkinos শব্দ থেকেই carcinogen, carcinoma কথাগুলি এসেছে। ক্যানসারকে অন্য ভাষায় বলতে গেলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ম্যালিগন্যান্সি বা নিওপ্লাসিয়া (নতুন কোষ উৎপাদন) বলা হয়। এটা এমন একটা রোগ যাতে শরীরের কোনো অংশে যদি অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি বা অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন হয় এবং সেটা যদি শরীরে দ্রুত বিস্তার করে তখন তাকে ক্যানসার বলা হয়। যে টিউমার শরীরে বিস্তার করে না তাকে বিনাইন টিউমার বলা হয়।

**ক্যানসারের উপসর্গ এবং লক্ষণসমূহ :**

ক্যানসারের লক্ষণ ও উপসর্গ নির্ভর করে টিউমার বা আলসারের অবস্থানের উপর। এটা ঘটনা যখন ক্যানসারের সূত্রপাত হয় তখন কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। যখন ক্যানসারের পিণ্ডটা বেড়েই চলেছে বা ulcer formation হয়ে গেছে তখন থেকে উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ দেখা যায়। এখানে বলা দরকার, ক্যানসার কিন্তু great imitator অর্থাৎ নকলকারী। নকল সোনা ও আসল সোনা যেমন বোঝবার উপায় থাকে না, তেমনি কোনটা ক্যানসারের লক্ষণ আর কোনটা অন্য সাধারণ রোগের লক্ষণ তা বোঝা যায় না। যেমন ফুসফুসের ক্যানসারের পিণ্ড, তার কারণে bronchus-গুলি ব্লকেজ হলো, ফলে রোগীর সর্দিকাশি, জ্বর, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, আবার ক্রনিক ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, জ্বর, সর্দিকাশি— এ দুই প্রকারের মধ্যে পৃথক করার কঠিন হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে খাদ্যনালী বা মলদ্বারে ক্যানসারের কোনো উপসর্গ আমরা লক্ষ্য করতে পারি না যতক্ষণ না খাদ্যনালী সংকুচিত হওয়ার ফলে রোগীর খাবার গিলতে অসুবিধা বা যন্ত্রণা হয়; আবার colorectal ক্যানসারের ক্ষেত্রে মলদ্বার সংকুচিত হওয়ার কারণে bowel habit পরিবর্তিত হলে তখন রোগী বা তার পরিজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, ততক্ষণে কিন্তু অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তবে এটাও ঠিক Breast বা testicles-এ পিণ্ড হলে সহজে তা উপলব্ধি করা যায়। আবার ক্যানসারের Ulceration-এর ক্ষেত্রে—

- ফুসফুসে হলে কাশির সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তেমনই টিবি হলেও রক্ত নির্গত হতে পারে।
- মূত্রথলিতে হলে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বা haematuria হয় আবার অন্য ইনফেকশনের কারণেও haematuria হতে পারে।
- মলদ্বার ক্যানসারের কারণে রেকটাল ব্লিডিং হতে পারে, তেমনই অন্যান্য colorectal ulcer থেকেও রেকটাল ব্লিডিং হতে পারে।

ক্যানসারে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় যেগুলির সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগ থাকে না বটে তবে যেন কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ

ওজন কম হতে থাকে, জ্বর হয়, খুব ক্লান্ত লাগে, তা ছাড়া শরীরের চামড়ায় এক প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

**Metastasis (স্থানান্তরণ) :**

প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো Metastasis ব্যাপারটা কী?

- ক্যানসারের original site থেকে 'local spread' হলো।
- Lymph node (শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অংশ)-এর মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একে lymphatic spread বলা হয়।
- Haematogenous spread অর্থাৎ রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে

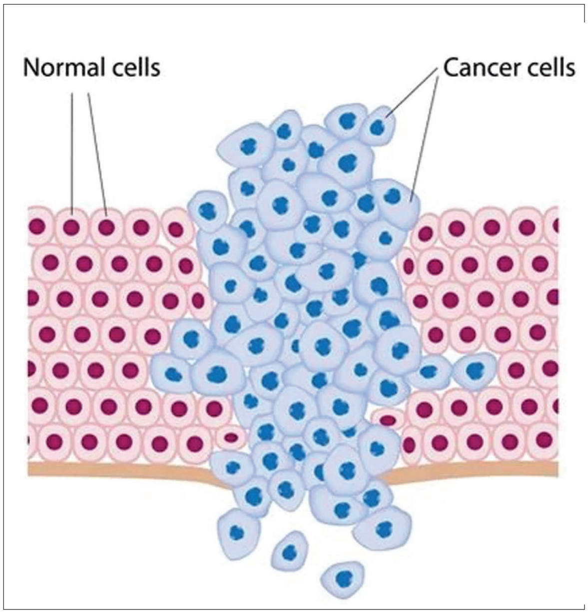


ছড়িয়ে পড়ে। (যদিও একটা Hypothesis বা ধারণা আছে ক্যানসারের বীজ একটা নির্দিষ্ট জমিতে বেড়ে ওঠে। অর্থাৎ শরীরের নির্দিষ্ট কয়েকটা স্থানে হয়।) Metastasis-টাও নির্ভর করে ক্যানসারের অবস্থানের উপর। এখানে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি লক্ষণ হলো— Enlarged lymph node যেটা চামড়ার তলায় palpate করা যায় তা হয়ে ওঠে typically hard। এছাড়াও লক্ষণ হলো Enlarged liver and spleen যেটা clinically বোঝা যায় এবং সঙ্গে হালকা যন্ত্রণাও থাকে।

**ক্যানসারের কারণ :**

এখনো এটা এক প্রকার বলা অসম্ভব যে কী কারণে একজনের ক্যানসার হয়। তবে মূলত দু'টি কারণকে এর জন্য দায়ী করা হয়।

**পরিবেশগত :** যেটা ৯০-৯৫ শতাংশ ক্যানসারের কারণ।

**বংশগত :** যেটা ৫-১০ শতাংশ ক্যানসারের কারণ।

ক্যানসারের কারণে মৃত্যুর পরিবেশগত কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— তামাকজাত সামগ্রী : ২৫-৩০ শতাংশ; খাদ্যাভ্যাস, স্থূলতা : ৩০-৩৫ শতাংশ; সংক্রমণজনিত কারণ : ১৫-২০ শতাংশ এবং বিকিরণ থেকে ১০ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি প্রচুর ধূমপান করেন, তার ফুসফুসে ক্যানসার হলো, অতএব ধরা হলো তার তামাক সেবনের ফলে ক্যানসার হয়েছে কিন্তু এটা কি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বায়ুদূষণ বা তেজস্ক্রিয় থেকে হয়নি? তবে এটা ঠিক ফুসফুস ক্যানসার এবং ধূমপান ভীষণ সম্পর্কযুক্ত। তামাক থেকে শুধু ফুসফুসে ক্যানসার নয়, তার গলা, ব্রেন, পাকস্থলী, মূত্রস্থলী, কিডনি, খাদ্যনালী, অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার হতে পারে। অতিরিক্ত সুপারি চিবালেও মুখগহ্বরে ক্যানসার হতে পারে। জাপানিরা বেশি লবণ খাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে গ্যাসট্রিক ক্যানসারের রোগী বেশি। আবার আমেরিকায় কোলন ক্যানসার বেশি তাদের মাংস খাওয়ার জন্য।

অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনও ক্যানসারের কারণ হতে পারে। হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাটিস-সি ইনফেকশন থেকেও ক্যানসার হতে পারে। এগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ ধরনের পদার্থ আছে যাদের carcinogen বলা হয়, এর কারণেও ক্যানসার হয় যেমন অ্যাসবেসটস, কাচের কণা, পাথরের কণা ইত্যাদি। কিছু মেটাল যেমন সিসা, কোবাল্ট, নিকেল যেগুলি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের রং করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার ডিজেল গাড়ির ধোঁয়া থেকে যে carcinogenic substance নির্গত হয় তা থেকেও ক্যনসার হতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে যদি লবণ রেখে খাওয়া হয় ওই স্টিল থেকে nickel leakage হয় যেটা ক্যানসার হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ১০০টির বেশি Carcinogenic পদার্থকে নির্ণয় করা গেছে যা থেকে ক্যানসারের সম্পর্ক আছে; তেমনই কিছু ভাইরাসকেও ক্যানসারের জন্য দায়ী করা হয়। বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকেও ক্যানসার হতে পারে। আবার প্যাসিভ স্মোকিং বা ধূমপানের পরোক্ষ প্রভাব থেকেও ক্যানসার হতে পারে। যদিও সব ক্যানসারই বংশগত নয়, তবে কিছু ক্যানসার বংশগত অর্থাৎ জেনেটিক কোষ থাকে। যেমন ব্রেস্ট ক্যানসার, ওভারিয়ান ক্যানসারের ক্ষেত্রে জেনেটিক ফ্যাক্টর কাজ করে।

**প্রতিরোধ ব্যবস্থা :**

ক্যানসার কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় এবং ক্যানসারের কারণে মৃত্যুর হার কমানো যায়। যেহেতু ক্যানসারের জন্য পরিবেশগত কারণ ৯০-৯৫ শতাংশ দায়ী, তাই সব না হলেও বেশ কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব। পান, গুটখা, খৈনি, অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে বিরত হলে এবং পরিমিত আহার, শাকসবজি, ফল, গোটা শস্য বা হোল গ্রেইন সেবনে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়। Vaccination-এর দ্বারা কিছু সংক্রামক রোগকে প্রতিরোধ করে ক্যানসার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আবার প্যাকেটজাত মাংস এবং রেড মিট বিশেষত ঝলসানো মাংস (মাংসের তন্দুরি, শিক কাবাব)-এগুলি না খেলে, কেমিক্যাল রং খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার না করলে, ডিজেল চালিত গাড়ির ব্যবহার বন্ধ করলে ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব। আবার Screening test-এর দ্বারা early detection হলে cervial এবং colorectal cancer prevent করা সম্ভব। ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে পরিচিত আহার এবং শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে। অতিরিক্ত কফি সেবন থেকেও লিভার ক্যানসার হতে পারে। প্রক্রিয়াজাত মাংস, রেড মিট থেকেও স্তন, কোলন, প্রোস্টেট গ্রন্থি, প্যানক্রিয়াসে ক্যানসার হতে পারে, তাই এগুলি এড়িয়ে চলা জরুরি।

**কলকাতায় সরসঙ্ঘচালক : বক্তৃতামালা—১**

# হৃদয়-মনে রাষ্ট্রীয় বিচারধারার বীজ বপন করে সঙ্ঘোপলব্ধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১০০ বছরের কর্মসূচির কথা যখন আমরা ভাবতে বসলাম, তখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে মানুষ সঙ্ঘের নাম জানে কিন্তু কাজ জানে না। এমনকী সঙ্ঘের হিতৈষীদের মধ্যেও এ বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই।

এখন সঙ্ঘ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, কারণ সঙ্ঘের কাজ দেশে ও বিশ্বে এক অনন্য কাজ। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষ সঙ্ঘোপলব্ধি করতে আসে। তারা একটি প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরাও আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মের জন্য এরকম কিছু করতে চাই, আপনারা আমাদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন?' এর অর্থ হলো সঙ্ঘ যে পদ্ধতিতে কাজ করছে, সেই পদ্ধতি তাদের কাছে নেই। এমনকী আমাদের দেশের ইতিহাসেও আমার মনে হয় না যে তথাগত বুদ্ধের পর থেকে সমগ্র ভারতে একযোগে এমন কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে।

তাই যদি সঙ্ঘকে জানতে হয়, তবে একে 'জানা থেকে অজানা'র (known to unknown) সাধারণ পদ্ধতিতে বোঝা সম্ভব নয়, কারণ এর সঙ্গে তুলনা করার মতো দ্বিতীয় কিছু নেই। যেমন রামায়ণে বলা হয়েছে, 'আকাশ আকাশের মতোই, আর সমুদ্র সমুদ্রের মতোই।' সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই। সঙ্ঘের মতো দ্বিতীয় কোনো সংগঠন নেই। আপনি যদি তুলনার মাধ্যমে সঙ্ঘকে বোঝার চেষ্টা করেন, তবে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে। আমাদের গণবেশে প্যারেড করতে দেখে যদি কেউ ভাবেন এটি একটি আধা-সামরিক (paramilitary) সংগঠন, তবে তা ভুল হবে। স্বয়ংসেবকরা দেশের নানা প্রান্তে সরকারি অর্থ সাহায্য না নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ১৩ লক্ষের বেশি সেবা প্রকল্প চালান; এটি দেখে যদি কেউ একে স্রেফ একটি 'সেবা সংগঠন' ভাবেন, তবে সেটিও ভুল হবে। আবার বর্তমানে স্বয়ংসেবকরা রাজনীতি ও সরকার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন বলে অনেকে বিজেপির মাধ্যমে সঙ্ঘকে বোঝার চেষ্টা করেন; সেটিও হবে এক বিরাট ভুল। সঙ্ঘকে বুঝতে হলে সঙ্ঘকেই দেখতে হবে এবং কেবল দেখেও একে বোঝা যায় না—একে অনুভব করতে হয়, কারণ প্রত্যেকেই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন। এক অন্ধ ব্যক্তির গল্প রয়েছে, যার বন্ধু তাকে বলেছিল সে 'পায়েস' খেয়েছে। অন্ধ ব্যক্তিটি যখন জানতে চাইলেন পায়েস কী, বন্ধু বললেন এটি দুধ দিয়ে তৈরি ও সাদা। অন্ধ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাদা কী?' বন্ধু উত্তর দিলেন, 'বকের মতো সাদা'। বন্ধুটি তখন তার হাতটি বকের ঘাড়ের মতো বাঁকা করে অন্ধ লোকটিকে স্পর্শ করে অনুভব করতে বললেন। তা অনুভব করার পর অন্ধ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত বাঁকা পায়েস কি তোমার গলায় আটকে যায়নি?'

আবার সঙ্ঘ সম্পর্কে ভুল বয়ান বা সরাসরি মিথ্যা প্রচার করার মতো মানুষও আছেন। সঙ্ঘের কোনো শত্রু নেই, কিন্তু সঙ্ঘ বাড়লে যাদের 'স্বার্থের দোকান' বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয়, তারা সঙ্ঘ সম্পর্কে অনবরত ভুল কথা বলেন। এখন আমরা বড়ো হয়েছি, দেশজুড়ে সঙ্ঘকাজ বিস্তৃত হয়েছে বলে মানুষ আমাদের কথা শোনে, কিন্তু আগে শুনত না। এই ক্রমাগত অপপ্রচারের ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, যার কারণে মানুষ অনেক সময় সেখানে যেতে ভয় পায়। ফলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে মানুষ সঙ্ঘের নাম জানে কিন্তু কাজ জানে না।

২০১৮ সালে আমরা দিল্লিতে একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম করেছিলাম যেখানে ২০০০ জন বুদ্ধিজীবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাতে ১৭০০ জন এসেছিলেন। সেখানে দু'দিন বক্তৃতা এবং একদিন প্রশ্ন-উত্তর ছিল। এটি করা হয়েছিল যাতে মানুষ সেকেন্ডারি সোর্সের ভিত্তিতে ধারণা না করে সঙ্ঘের প্রকৃত স্থিতি জানতে পারে। এবার আমরা ঠিক করেছি

ওরকম কার্যক্রম চারটি প্রধান শহরে করব। সময়ের স্বল্পতার কারণে কলকাতায় আমাকে তিন দিনের বিষয়বস্তু একদিনেই রাখতে হচ্ছে।

আসুন, আমরা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভাবনা সরিয়ে রেখে সঙ্ঘকে সরাসরি অনুভব করি। সঙ্ঘ কেন শুরু হয়েছিল? এর উত্তর আমরা শাখায় প্রতিদিনের প্রার্থনার একটি বাক্যে দিতে পারি, তাহলো 'ভারতমাতা কী জয়'। আমরা চাই ভারত 'বিশ্ববিজয়ী' হোক এবং 'বিশ্বগুরু'র আসনে আসীন হোক। সমাজকে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে বা ভারতকে বিশ্বগুরু বানাতে পারে। ভারত কেবল একটি ভূগোল নয়; এটি একটি স্বভাব এবং একটি ঐতিহ্যের নাম। সঙ্ঘ কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বা কোনো পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় অথবা কারও বিরোধিতা করার জন্য শুরু হয়নি। এটি শুরু হয়েছে হিন্দু সমাজের সংগঠন, উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রাম হয়েছিল, তাতে অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আমরা হেরে গিয়েছিলাম। সেই হারের পর আমাদের নেতাদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হলো যে— এত সৈন্য, রাজা ও দক্ষ যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু বিদেশি কীভাবে আমাদের পরাজিত করল? একটি চিন্তাধারা ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার। এই ধারা আমাদের এমন সব মহান মহাপুরুষ উপহার দিয়েছে যাদের জীবনী আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

অন্য একটি চিন্তা ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাজারা লড়লেও সমাজ ঘরে বসে ছিল। সমাজ স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না, কিন্তু তাদের ভূমিকা কী তা তারা জানত না। তাই সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রয়োজন ছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে নেতারা একে রাজনৈতিক জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চ বানিয়েছিলেন। এতে ব্যাপক জনজাগরণ হয়েছিল। মানুষ জেলে গিয়েছে, লাঠি খেয়েছে, আর যারা সরাসরি আন্দোলনে ছিলেন না তাঁরা সত্যাগ্রহীদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন বা চরকা কেটেছেন। সাধারণ মানুষ অনুভব করেছিল যে তারা দেশের জন্য বাঁচছে।

তৃতীয় একটি ধারা মনে করত যে আমাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস রয়েছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমাজ সংস্কার প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে শুরু হওয়া এই ধারা আজও চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সংস্কারগুলো সমাজ সাগরে এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে রয়ে গেল। যেমন বিদর্ভের একটি গ্রামে এক মহাত্মা ৩০ বছর ধরে ৩৮টি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ দূর করার কাজ করেছিলেন। আজ তাকে খুব শ্রদ্ধা করা হয়, কিন্তু সেই ৩৮টি জাতি আরও একটি নতুন ৩৯তম একটি জাতির জন্ম দিয়েছে— যারা জাতিভেদ মানে না।

চতুর্থ একটি ধারণা ছিল যে আমরা আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য— 'ঘট ঘট মেঁ রাম' অর্থাৎ 'প্রতিটি শরীরে, প্রতিটি হৃদয়ে রাম' এই সত্যটি ভুলে গেছি বলেই আমাদের পতন হয়েছে। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার এই চারটি ধারাতেই কাজ করেছিলেন এবং একজন কর্মী হিসেবে সংগঠন গড়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না; তিনি জন্মগতভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় রানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হলে তিনি তা আবর্জনায় ফেলে দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'এটি মিষ্টি নয়, বিষ', কারণ এটি এক বিদেশি রানির রাজ্যাভিষেক উদ্‌যাপনের জন্য দেওয়া হচ্ছে।

মাত্র ১১ বছর বয়সে একই দিনে তাঁর বাবা-মা দুজনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি নাগপুরের স্কুলে সংগঠন গড়ে তোলেন। যখন স্কুল পরিদর্শক এলেন, তাঁকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হলো। ব্রিটিশ সরকার স্কুল বন্ধ করে দিয়ে এর হোতাকে খুঁজতে শুরু করল। সেই পরিকল্পনার মূলে ছিলেন কেশব হেডগেওয়ার এবং তাঁর ছাত্রবন্ধুরা। পরে যখন শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা চেয়ে স্কুল খোলার কথা বলা হলো, তিনি নিজের জন্মভূমিকে বন্দনার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন এবং স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে তিনি প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

নাগপুরের নেতারা তাঁকে কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারি পড়া ছিল কেবল একটি বাহানা। তাঁর আসল উদ্দেশ্য অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং পশ্চিম ভারতের বিপ্লবী কাজের সমন্বয় করা। তিনি দুটি কাজেই সফলভাবে করেছিলেন— প্রথম বিভাগে ডাক্তারি পাশ করা এবং রাজস্থান থেকে অন্ধ্র পর্যন্ত বিপ্লবীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। যখন সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হলো, তিনি কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই জীবনে কেবল দেশের কথাই ভাববেন। তিনি বার্মায় উচ্চ বেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং অবিবাহিত থেকে দেশের সেবায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি রাজদ্রোহের মামলায় অভিযুক্ত হন। বিচারে তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন এবং

আদালত উভয়ই অবৈধ, কারণ স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে লিখেছিলেন যে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য মূল বক্তৃতার চেয়েও বেশি 'রাজদ্রোহমূলক' ছিল।

লোকমান্য তিলক, গান্ধীজী, বীর সাভারকর, সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি জাতির পরাধীনতার মূল সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন। কেন মুষ্টিমেয় বিদেশি বার বার আমাদের দেশ দখল করেছে? এর কারণ আমাদের সমাজের স্বার্থপরতা ও বিভেদ। এমনকী আমরা স্বাধীনতা পেলেও আমরা যদি বিভক্ত থাকি তবে তা রক্ষা করব কীভাবে? তাই ডাঃ হেডগেওয়ার সমাজের ঐক্য ও গুণমান তৈরির দিকে মনোযোগ দেন। ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীতে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘ কোনো প্রতিযোগিতা নয়, কোনো প্রতিক্রিয়া নয় এবং কারও বিরোধিতা নয়, এটি পূর্ণ করতে এসেছে, ধ্বংস করতে নয়।

তাঁর পদ্ধতি ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা। যেহেতু ১০০ কোটি মানুষ একটি সংগঠনে জায়গা দিতে পারে না, তাই তিনি 'ব্যক্তি নির্মাণ'-এর মাধ্যমে একদল কর্মী তৈরি করার দিকে মনোযোগ দেন। কোনো জাতি কেবল নেতা বা নীতির কারণে মহান হয় না; এটি মহান হয় সাধারণ সমাজের ঐক্য ও গুণমানের ভিত্তিতে। শরীরকে সুস্থ রাখতে ব্যায়াম করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই একটি সংগঠিত অবস্থা হলো সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা।

কেন 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে? কারণ হিন্দু সমাজই এই দেশের মূল সমাজ। ভারতবর্ষ একটি হিন্দু রাষ্ট্র। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য রজনী পাম দত্ত লিখেছিলেন যে ব্রিটিশরা না এলেও বেদের মাধ্যমে ভারতের গণতন্ত্র অর্জন করা সম্ভব ছিল। আমাদের দেশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সকল বৈচিত্র্যকে সম্মান করা। এই ঐতিহ্যের মান্যতাকারীদের 'হিন্দু' বলা হয়। 'হিন্দু' কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি বা ভাষার নাম নয়; এটি একটি বিশেষণ। যে কেউ এই সংস্কৃতি ও এর মূল্যবোধকে গ্রহণ করে— তার উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন— সে হিন্দু সংস্কৃতির অংশ। আমরা সমগ্র বিশ্বকে এক হিসেবে দেখি। ভারতভূমি আমাদের সংস্কার দিয়েছে বলে তাঁকে ভারতমাতা বলি। বিজ্ঞান বলছে ইন্দো-ইরানিয়ান রেলম্ বা এই উপমহাদেশীয় ক্ষেত্র জুড়ে বসবাসকারী মানুষের ডিএনএ গত ৪০,০০০ বছর ধরে একই রয়েছে; আমরা একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

ভারতে সবাই সংস্কৃতিগতভাবে হিন্দু। ভারতকে মহান করার অর্থ হলো এই মূল্যবোধগুলোকে উন্নত করা। সঙ্ঘের পদ্ধতি খুব সহজ— 'শাখা'। এক ঘণ্টার জন্য আসুন, শরীরের জন্য ব্যায়াম করুন, দেশের জন্য ভাবুন এবং সব ভেদাভেদ ভুলে যান। সবাইকে ভারতমাতার সন্তান হিসেবে গণ্য করার প্রশিক্ষণ নিন। সঙ্ঘ সমাজের মধ্যে কোনো সংগঠন তৈরি করতে চায় না; এটি সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করতে চায়। সঙ্ঘ নিজে সব কাজ করে না; সঙ্ঘে সংস্কারপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকরা সমাজে গিয়ে নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ শুরু করেন। সঙ্ঘ কোনো দল বা মতাদর্শ বিচার না করে নিঃস্বার্থভাবে যে কোনো ভালো কাজে সাহায্য করে।

সঙ্ঘ ১০০ বছর পূর্ণ করেছে, কিন্তু এই যাত্রা সহজ ছিল না। কীভাবে একজন থেকে আজ লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক তৈরি হলো এবং আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা কী, তা আমি পরের সত্রে বলব।

**কলকাতা বক্তৃতামালা—২**

## সঙ্ঘশতবর্ষে রাষ্ট্রসাধনার নবদিগন্ত

প্রথম সত্রের বক্তৃতায় আমি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পেছনের ভাবনাচিন্তা এবং তার কারণগুলো বলেছিলাম। মনুষ্য নির্মাণের কাজ অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যখন ডাক্তার হেডগেওয়ার বলতেন, সঙ্ঘ নিজে কিছু করবে না কিন্তু স্বয়ংসেবকরা কিছু বাকি রাখবে না, তখন মানুষের কাছে এটি একটি হেঁয়ালি মনে হতো, কিন্তু তা ছিল না। সমাজে কাজ করতে গেলে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে নানা

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা চলে। সম্পূর্ণ সমাজকে নিজের মনে করা, অর্থাৎ সব ধরনের মানুষকে আপন করে নেওয়া; যার মধ্যে জাতি, পন্থ, ভাষা, প্রদেশ— সবই আসে। মতপার্থক্য থাকতে পারে, কারও মত-পথ আলাদা হতে পারে, মতাদর্শের প্রতিযোগিতা হতে পারে, কিন্তু সবার মন এক থাকা— এটি একটি গুণ। সমাজে অনেক মত-পথ থাকা সত্ত্বেও এক হয়ে চলা। আজ আমেরিকা বড়ো হয়েছে, কিন্তু কীভাবে? যখন যুদ্ধের সময় এল, যখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর সবচেয়ে বড়ো বিরোধীকে নিজের যুদ্ধমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের সমদৃষ্টি যদি তৈরি করতে হয়, তবে কোনো ব্যক্তিকে শুরু থেকেই সমস্যার মধ্যে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়।

তাই এসব থেকে দূরে থেকে নির্লিপ্তভাবে মানুষের চরিত্র নির্মাণের কাজ করা হয়। তাহলে বাকি কাজের ব্যবস্থা কী? সঙ্ঘ থেকে তৈরি হওয়া স্বয়ংসেবকরাই বাকি সব সামলাবে, সঙ্ঘ সরাসরি এসবে জড়িত হয় না। বিভিন্ন সংগঠন চলছে, নানা কর্মকাণ্ড ও সংস্থা রয়েছে, কেউ ব্যক্তিগতভাবেও কাজ করছেন— এরা সবাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং তারা চিরকালই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সঙ্ঘ তাদের বিচার, সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে; তার ভিত্তিতে তারা স্বতন্ত্র, আলাদা, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাবলম্বী হয়ে কাজ করছেন, এটাই প্রত্যাশা এবং আমরা এভাবেই চলি। এত মানুষ কাজ করছেন, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সবাই একনিষ্ঠ, কিন্তু সঙ্ঘের কোনো রিমোট বা ডাইরেক্ট কন্ট্রোল তাদের ওপর থাকে না। এটি সঙ্ঘের পদ্ধতিই নয়। এমনকী সঙ্ঘের শাখাতেও যারা আসেন, তাদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের কাছে কী ব্যবস্থা আছে? আমাদের কাজ তো বন্ধুত্ব ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমের ওপর ভিত্তি করে চলে। তাই ব্যাক-সিট ড্রাইভিং বা কন্ট্রোল করার যে কথাগুলো (ন্যারেটিভ) বাজারে ঘোরে, সেগুলো কেন ও কীভাবে আসে তা আপনারা জানেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্বশীল স্বয়ংসেবকরা এসব থেকে দূরে থাকেন। প্রশিক্ষিত হওয়ার পর যে ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ হয়,

সেখানকার শৃঙ্খলা মেনে তারা কাজ করেন। তাই আমি বলেছি, যারা বাইরে কাজ করছেন তাদের মাধ্যমে সঙ্ঘকে বিচার করতে চাইলে ভুল হতে পারে, কারণ তাদের অনেক সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। আপনারা সঙ্ঘ সম্পর্কে ঠিক তখনই জানতে পারবেন, যখন আপনারা প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ঘের শাখা, স্বয়ংসেবক অথবা তাদের পরিবারের জীবন দেখবেন। সঙ্ঘ নিজে কিছু করে না। স্বয়ংসেবকরাই সব করছেন এবং তারা স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে সংলাপ এবং আলাপ-আলোচনা অবশ্যই চলে। তারা সাহায্য চাইলে আমরা করি; ভালো কাজের জন্য আমরা যে কাউকে সাহায্য করতে রাজি।

ডাক্তার হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে সঙ্ঘ শুরু করার আগে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। সম্ভবত অনুশীলন সমিতি বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিত্য কর্মসূচি এবং শারীরিক-বৌদ্ধিক কার্যক্রমের পদ্ধতি তিনি দেখেছিলেন এবং ভারতের সমস্ত প্রকৃতির মানুষের মধ্যে সব ধরনের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে কীভাবে এই কাজ চালানো সম্ভব, তার প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো তিনি শিখে নিয়েছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দিন তিনি শুধু হিন্দু সমাজের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আজ থেকে এই সংগঠন করার কাজ শুরু হচ্ছে। তিনি কখনো বলেননি যে 'আমি এটি শুরু করেছি'। ডাক্তার হেডগেওয়ার সঙ্ঘের বীজ; তিনি না থাকলে সঙ্ঘ সৃষ্টি হতো না। সঙ্ঘকে বুঝতে হলে তাঁর চরিত্র জানা জরুরি, আর তিনি কেমন ছিলেন তা বুঝতে হলে সঙ্ঘকে দেখা প্রয়োজন। তিনি কখনো নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে দেননি। ডাক্তারজীর একটি শব্দের জন্য স্বয়ংসেবকরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন, কিন্তু তিনি কখনো সেই প্রভাবের অপব্যবহার করেননি।

সঙ্ঘ যখন শুরু হয়, তখন বিশেষ কিশোর তরুণরাই এগিয়ে এসেছিল। অভিজ্ঞ ও বড়ো নেতারা তখন অন্যান্য আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তারজীর কাছে আসত শিশু, কিশোর ও তরুণরা। সঙ্ঘের

*(এরপর ৩১ পৃষ্ঠায়)*

# শিলিগুড়ি ও কলকাতায় সরসঙ্ঘচালক

# এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন

**সাধন কুমার পাল**

কলম ধরতেই মনে পড়ে যায় রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের বিখ্যাত উক্তি— Veni, Vidi, Vici— আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম। এই কথাই যেন প্রায় সার্থকভাবে ধরা পড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ সফরের প্রেক্ষাপটে। সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এটি কেবল একটি সাংগঠনিক কার্যক্রম নয়, বরং বঙ্গীয় সমাজ ও জনমানসে সঙ্ঘকে নতুনভাবে বোঝার, অনুভব করার এবং তার বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক যুগান্তকারী প্রয়াস।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সরসঙ্ঘচালকজীর এবারের সফর ছিল এক অনন্য অধ্যায়। প্রতিটি কর্মসূচিতে কার্যকর্তা ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, উৎসাহ, শৃঙ্খলা ও কৌতূহল ছিল নজরকাড়া। সঙ্ঘকে ভেতর থেকে জানার আগ্রহ, সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা শুধু স্বয়ংসেবক ও সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; সমালোচকদের মধ্যেও একই আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

উত্তরবঙ্গ যুব সম্মেলনে এবং দক্ষিণবঙ্গের বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয়, পূর্বধারণা বা মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই তালিকায় ছিলেন সঙ্ঘের কট্টর সমালোচক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, ক্রীড়াজগৎ ও সংবাদমাধ্যমের খ্যাতনামা প্রতিনিধি, এমনকী অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুরো অনুষ্ঠানকে এমনভাবে আয়োজিত করা হয়েছিল, যাতে তারা মুক্তভাবে প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন করার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত করা হয়েছিল, সব প্রশ্ন যেন সরাসরি সরসঙ্ঘচালকের সম্মুখে উপস্থাপন করা যায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে এই প্রশ্নগুলির মধ্যে বিরোধীরা বেশ কয়েকটি দীর্ঘদিন ধরে তাদের 'ব্রহ্মাস্ত্র' বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক সেই সব প্রশ্ন, অক্লেশে, সংযমী ও যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্তর দিয়েছেন। প্রতিটি উত্তরে ছিল ইতিহাসের প্রেক্ষাপট, সমাজের বাস্তবতা ও সংবেদনশীলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এটি কেবল উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মনকে

প্রভাবিত করেনি, বরং মিডিয়ার মাধ্যমে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ২১ ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সভায় ইউটিউবার সফিকুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আগে ও পরে করা ভিডিয়োগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি প্রথমবারের মতো সঙ্ঘের কার্যক্রমে এসে কতটা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, হিন্দু সমাজের সংগঠন দেশের শক্তিশালী ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। আরেক প্রভাবশালী সমালোচক সুমন চট্টোপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানের পরে প্রকাশ্যভাবে বলেছেন, মুসলমান বিরোধিতার প্রশ্নে ডাঃ ভাগবতের উত্তর ও যুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা তার মনকে মুগ্ধ করেছে।

গত ১৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলন ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। প্রায় ৭৫০০ যুবক-যুবতী নিজেদের খরচে অংশগ্রহণ

করেন। বিপুল সাড়া ও আবেদনের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের প্রায়৪০ শতাংশ প্রথমবার সঙ্ঘের কোনো কার্যক্রমে এসেছিলেন। তবুও শৃঙ্খলা, সংযম, অনুশাসন এবং পরিবেশের সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করেছে। বক্তব্যের সময় করতালির অনভ্যস্ততা সত্ত্বেও পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল এক অভূতপূর্ব ছন্দ ও সৌহার্দ্য।

'স্বস্তিমন্ত্র' পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম সত্রের শুভ সূচনা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতজী, সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধরজী এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। তাঁদের মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'ধনধান্য পুষ্পভরা'

গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন। প্রথামাফিক পরিচয় পর্বের পর সরসঙ্ঘচালক যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

যুব সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালকজী বলেন— ভবিষ্যতের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিক বা না নিক, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে যুবসমাজের কাঁধেই এসে পড়বে। আমরা যদি কেবল নিজেদের জন্যই কাজ করি, তবে কি আমি ও আমার পরিবার সত্যিই নিরাপদ থাকবে? দেশে যখন সংকট এসেছে, তখনই সমাজ জাগ্রত হয়েছে। শক-হুন-মোগল-পাঠান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনকালেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

সমাজকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে ভারতীয় নেতারা নিজেদের করে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে স্বার্থের কারণে সেই রাজনৈতিক ধারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সমাজে বিদ্যমান ভেদাভেদ ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দূর করার লক্ষ্যেই সমাজ সংস্কারের ধারার সূচনা হয়েছিল। 'আমরা কারা? আমাদের আপনজন কারা?'— এই আত্মবোধকে পুনরায় জাগ্রত করতে দয়ানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় কাজ শুরু হয়।

কিশোর বয়সেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার নাগপুরের বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম্' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। বীর সাভারকর, সুভাষচন্দ্র বসু ও লোকমান্য তিলকের মতো মহাপুরুষদের ডাক্তারজী উপলব্ধি করেছিলেন— সমাজকে সংশোধন ও সংগঠিত না করলে দেশের মুক্তি ও উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগে ডাঃ হেডগেওয়ার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে পশ্চিম ভারতেও বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তার ঘটান। রাজদ্রোহের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন— কোন আইনের ভিত্তিতে ইংরেজরা ভারত শাসনের অধিকার পেয়েছে?

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে ব্যক্তি-নির্মাণের কাজের সূচনা করেন ডাক্তার হেডগেওয়ার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে নেতৃত্বদান এবং অন্তর থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের 'নায়ক' বলে অভিহিত করেছেন।

আজ যারা নিজেদের 'হিন্দু' বলে মানতে চান না, তাঁরাও হিন্দু পূর্বপুরুষদেরই বংশধর। পূজাপদ্ধতি ও খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা এক রাষ্ট্র ও এক সংস্কৃতির অংশ। যার হৃদয়ে ভারতভক্তি নেই, সে হিন্দু নয়। সকল বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, এমন স্বতন্ত্র পরম্পরাই আমাদের 'হিন্দু সংস্কৃতি'। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে কাজ করে এগিয়ে চলেছেন। ভারতের প্রতিটি ব্যক্তি ভারতের জন্য বাঁচবে, ভারতের জন্য মরবে, ভারতকে জানবে ও ভারতকে মানবে। ভারতীয় মহাপুরুষদের চিন্তা ও অনুভবের সারাংশকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার একটি প্রক্রিয়ার নাম সঙ্ঘ। আমরা বলি— 'বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য রয়েছে।'

তিনি বলেছেন, 'সংবিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাড়িতে রাখুন ও তা অধ্যয়ন করুন। সঙ্ঘে আসুন, সঙ্ঘকে পরখ করুন এবং সবকিছু সঠিক মনে হলে সঙ্ঘের কাজে যুক্ত হন। আসুন, আমরা সকলে দেশের উত্থানের এই মহান অভিযানে অংশীদার হই।' এই সম্মেলন সফল করতে প্রায় এক হাজার স্বয়ংসেবক প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে কেউ কেউ চোখে জল ধরে রাখতে পারছিলেন না। অংশগ্রহণকারী এক তরুণী বলেছিলেন, 'আমি এখানে এসে বুঝেছি, সঙ্ঘ শুধু রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠন নয়; এটি একটি চেতনার আন্দোলন, যা দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্ব এবং আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়।' এমন শতশত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি পুরো অনুষ্ঠানকে অনন্য করে তুলেছিল।

সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বক্তব্যে ব্যক্তি-নির্মাণ, সামাজিক ঐক্য, জাতীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক আত্মবোধকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্ঘমুখী করতে আসেনি। আমি এসেছি সঙ্ঘ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে। সিদ্ধান্ত আপনারা নিজেরাই নেবেন।' তিনি সংগঠনকে অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে তুলনা না করে, সঙ্ঘের স্বকীয়তা ও আদর্শ অনুধাবন করার আহ্বান জানান। ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবন এবং আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দর্শন ও হিন্দু সংস্কৃতির গভীরতা— সব মিলিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের মন ও হৃদয়ে এক গভীর ছাপ ফেলে।

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সম্মেলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজসেবার পথে নামার সংকল্পও ব্যক্ত করেছেন। এক নবীন স্বয়ংসেবক বলেন, 'আমি প্রথমবারের মতো এসেছি, কিন্তু আমি বুঝেছি, ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব।' এ ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুরো অনুষ্ঠানের গরিমাকে বহুগুণ বাড়িয়েছে।

সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই দুটি সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে কেবল দাগ রাখেনি; বরং নতুন উপলব্ধি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সংলাপের পথও তৈরি করেছে। তিনি এসেছেন, দেখেছেন এবং নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বহু মন জয় করে ফিরে গেছেন।

আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সঙ্ঘের ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও প্রভাবশালী হবে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ■


সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

*(২৭ পাতার পর)*

কাছে তখন কর্মী ছিল না, কোনো প্রচারের মাধ্যম ছিল না এবং ব্রিটিশ শাসন সবসময়ই বিপক্ষে ছিল। ডাক্তারজীর ব্যক্তিগত আয় বলতেও কিছু ছিল না। তাঁর পরিবার ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত। অনেক সময় বাড়িতে কেউ এলে চা তৈরি করার মতো জ্বালানি কাঠও বাড়িতে থাকত না। এক ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার অতিথিদের জন্য চা তৈরি করতে দেরি হওয়ায় ডাক্তারজী নীচে গেলে তাঁর বৌদি বলেন যে, উনুনে দেওয়ার মতো কাঠ নেই, এমনকী ঘরে দুধ, চা-পাতা বা চিনিও নেই। সমাজে তখন চরম উপেক্ষা ছিল, কিন্তু স্বয়ংসেবকরা নিজেদের নিষ্ঠা, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে কাজ চালিয়ে গেছেন।

ভাগলপুরে একজন প্রচারক পাঠানো হয়েছিল, যার কোনো নাম-ডাক বা টাকাপয়সা ছিল না। তিনি স্নাতকোত্তর পাশ ছিলেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাত ১০টায় স্টেশনে আসতেন এবং সকাল ৫টার ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত সেখানেই ঘুমোতেন। স্টেশনের শৌচাগার ব্যবহার করতেন। সারাদিন গ্রামে গ্রামে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করতেন। নাগপুর থেকে তাকে ১৫ টাকা দেওয়ার হয়েছিল, যার মধ্যে ১২ টাকাই টিকিটে চলে গিয়েছিল। খাবারের পয়সা ছিল না বলে একআনার ছোলা কিনে খেয়ে তিনদিন কাটিয়েছেন। পরে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। সেই ছাত্রের মা যখন জানতে পারেন যে এই যুবক নিজের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেশের কাজের জন্য এসেছেন, তখন তিনি নিয়ম করেছিলেন যে ওই প্রচারকের প্রতিদিনের খাবারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজে খাবেন না। এভাবেই সমাজের ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে সঙ্ঘ আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। সঙ্ঘের আর কোনো ভরসা নেই, এটি একটি ঈশ্বরীয় কাজ এবং ঈশ্বর জনগণের রূপেই আমাদের সহায় হন।

বিশ্বের ইতিহাসে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এত দীর্ঘ ও কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি যা সঙ্ঘের ক্ষেত্রে হয়েছে। আক্রমণ হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু স্বয়ংসেবকরা দমে যাননি। এই বিরোধিতা নিজের সমাজের মানুষের থেকেই হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাজের মূল ভিত্তিই হলো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম।

কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতার বদলে সমাজকে নিজের মনে করে আমরা সেবা করে চলেছি। এখন অনুকূল পরিস্থিতি এসেছে, মানুষের বিশ্বাস আমরা পাচ্ছি। তবে এই সময়েও আমাদের সাদাসিধে জীবন, প্রচারের আড়ালে থাকা এবং সবাইকে আপন করে নেওয়ার আদর্শ বজায় রাখতে হবে।

সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য আমরা বাইরের কারও থেকে টাকা নিই না, স্বয়ংসেবকরা নিজেরাই গুরু দক্ষিণার মাধ্যমে সঙ্ঘ চালান। স্বাবলম্বী হওয়ার কারণেই আমরা মাথা উঁচু করে সত্য বলতে পারি। এখন আমাদের সামনে লক্ষ্য হলো কাজের বিস্তার। দেশের পৌনে এক লক্ষ গ্রামে মণ্ডল এবং শহরের বসতিগুলোতে পৌঁছানো। শতবর্ষের পর গ্রামে গ্রামে হিন্দু সমাজের একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক এবং স্থানীয় নেতৃত্ব (লোকাল লিডারশিপ) গড়ে তোলা হবে। সমাজে অনেক 'সজ্জন শক্তি' আছে যারা নিঃশব্দে সেবা করছেন, আমাদের কাজ হলো তাদের মধ্যে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্কিং) তৈরি করা।

**আমরা স্বয়ংসেবকদের মাধ্যমে সমাজ 'পঞ্চ পরিবর্তন' অর্থাৎ পাঁচটি করণীয় কাজের আহ্বান জানিয়েছি :**

১. **স্ব-বোধের জাগরণ :** বাড়িতে যা তৈরি করা সম্ভব তা বাইরে থেকে আনবেন না। নিজের ভাষা, পোশাক, ভজন, ভোজন, ভবন ও ভ্রমণের প্রতি মমতা ও বোধ থাকতে হবে যে আমরা আসলে কে।

২. **নাগরিক কর্তব্য :** সংবিধানের চারটি প্রধান বিষয়— প্রস্তাবনা, নাগরিক কর্তব্য, নির্দেশক নীতি ও নাগরিক অধিকার— সবার জানা উচিত। ট্রাফিক আইন মানা থেকে শুরু করে ঠিক সময়ে কর দেওয়া পর্যন্ত সব নিয়ম পালন করা জরুরি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, 'সোশ্যাল কনশাসনেস' এবং 'সোশ্যাল ডিসিপ্লিন'ই হলো স্বাধীন দেশের প্রকৃত দেশভক্তি।

৩. **কুটুম্ব প্রবোধন :** বর্তমানে ঘরে ঘরে সংলাপের অভাব দেখা দিয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসুন। ভজন করুন, আহার করুন এবং 'মঙ্গল সংবাদ' (ভালো আলোচনা) করুন। নিজেদের ঐতিহ্য ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলুন যাতে শিশুদের মধ্যে ত্যাগের মানসিকতা তৈরি হয়।

৪. **সামাজিক সমরসতা :** আমরা হিন্দু সমাজকে ভাষা, প্রদেশ বা জাতির ভিত্তিতে দেখি না। সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বন্ধুত্ব থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে মন্দির, পানীয় জলের উৎস ও শ্মশান— সব হিন্দুর জন্য সমান হতে হবে।

৫. **পরিবেশ সংরক্ষণ :** জল বাঁচানো, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ত্যাগ করা এবং সবুজায়ন করা। এই কাজ নিজের বাড়ি থেকেই শুরু করতে হবে।

ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা আছে এমন এক 'সোশ্যাল আউটরিচ' বা জনসংযোগ করা, যাতে ভিন্ন মতাদর্শের মানুষও বোঝেন যে জাতি, সংস্কৃতি এবং দেশের নিরিখে আমরা সবাই এক। উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য অহংকার, উগ্রতা ও কট্টরতা ত্যাগ করতে হবে। ভারতের অগ্রগতি হচ্ছে মানে হিন্দু সমাজ উন্নত হচ্ছে।

সঙ্ঘ একা এই সব কাজ করতে পারবে না, সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সঙ্ঘের মনে কারও প্রতি বিদ্বেষ নেই। আপনারা আপনাদের রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী যেকোনো ভালো কাজে যুক্ত হন। আপনারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের যা-ই করবেন, সঙ্ঘ আপনাদের পাশে থাকবে। সঙ্ঘের নাম না জানলেও যদি আপনার আচরণ সমাজের হিতে হয়, তবে আমরা আপনাকে স্বয়ংসেবক বলেই মনে করবো।□

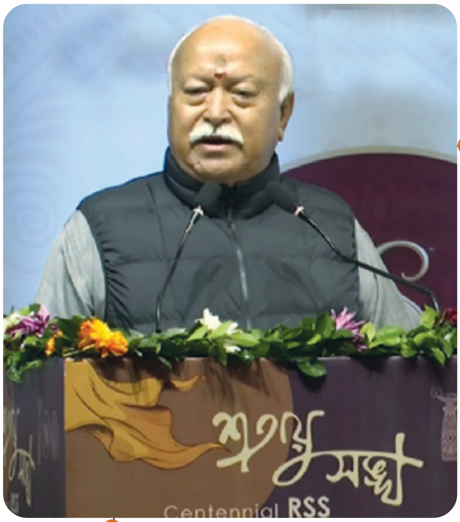


**ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রতি যুবকদের আকর্ষণ বাড়াতে সঙ্ঘের কোনো পরিকল্পনা আছে কি? শিল্পী ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য কোনো মঞ্চ তৈরি করা যায় কি? শিল্পীদের সম্মানের ব্যবস্থা কী ?**

সঙ্ঘ নিজে সরাসরি শুধু শাখা পরিচালনা করে। তবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা 'সংস্কার ভরতী' নামে একটি সংগঠন চালান, যা শিল্পীদের মঞ্চ দেওয়া এবং প্রশিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে। বাংলায় এর কাজ অত্যন্ত জোরালো। শিল্পীদের সম্মানের বিষয়ে কথা হলো— 'সম্মান অর্জন করতে হয়, দাবি করে পাওয়া যায় না' (Respect is commanded, not demanded)। যেসব শিল্পী সাধনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, সম্মান তাঁদের কাছে আপনা থেকেই আসে। শিল্প কেবল বিনোদন নয়, এটি হলো 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এর সাধনা এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যম। সঙ্ঘের নিজস্ব 'ঘোষ' (ব্যান্ড) আছে, যার সুর ও তাল ভারতীয় রাগ ও তাল শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আমাদের মূল কাজ হলো মানুষ গড়া, আর শিল্প ও সংস্কৃতি সেই সংস্কারেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ■

**সংস্কৃত ভাষার প্রসার এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (আইকেএস) যুক্ত করতে সঙ্ঘের কী পরিকল্পনা? ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য রক্ষায় কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ?**

'সংস্কৃত ভারতী' নামে সংগঠনটি ১০ দিনে সংস্কৃত কথা বলা শেখায়। কর্ণাটকের মত্তুর গ্রামের মতো এমন কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে সবাই সংস্কৃতে কথা বলেন। নতুন শিক্ষানীতিতে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানে অনেক কিছু আছে যা আজও প্রাসঙ্গিক। যেমন মহর্ষি পরাশর রচিত গ্রন্থে আবহাওয়া পূর্বাভাসের এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে যা আধুনিক প্রযুক্তির চেয়েও সহজলভ্য হতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের (বেদ, পুরাণ, উপনিষদ) প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে হবে। ■

**শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ এবং ৩৭০ ধারা বাতিলের পর সঙ্ঘের পরবর্তী লক্ষ্য কী ?**

সঙ্ঘের লক্ষ্য কোনো নির্দিষ্ট মন্দির নির্মাণ বা ৩৭০ ধারা বাতিল ছিল না। আমাদের স্থায়ী লক্ষ্য হলো সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা। এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ থামবে না। সমাজ যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও জাগ্রত হবে, তখন পরবর্তী পরিকল্পনা সমাজই ঠিক করবে। ■

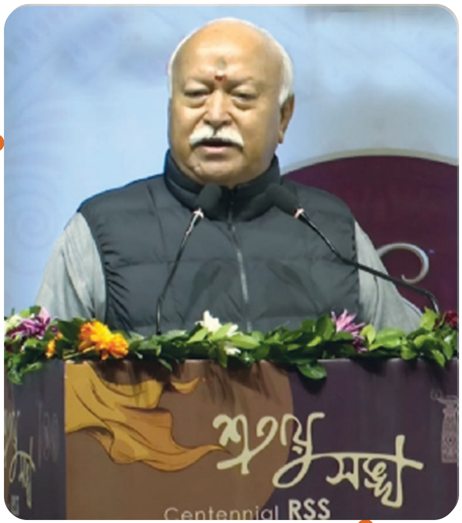


**সঙ্ঘের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এটি কীভাবে যুবমানসে সহজে প্রবাহিত করা যায়? নাগরিকরা কীভাবে দেশের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন? সোশ্যাল মিডিয়া ও মাদকদ্রব্যের কু-প্রভাবে যুবসমাজ পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং মহিলাদের প্রতি অপরাধ বাড়ছে। এই আধুনিকতার পরিবেশে যুবকদের সঙ্ঘের আদর্শে শিক্ষিত করা কীভাবে সম্ভব? সেই সঙ্গে বিদেশগামী মেধাবী তরুণদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সঙ্ঘের ভাবনা কী ?**

সঙ্ঘের 'পদ্ধতি' (Methodology) মূলত এর জন্যই। সব বয়সের মানুষের মনে এই আদর্শ স্থাপন করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা তৈরি করাই হলো শাখার মূল অভ্যাস। এর মূল ভিত্তি হলো— যদি কারও অভ্যাস বদলাতে হয় বা কোনো ভাব তার কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তবে সবার আগে প্রয়োজন বন্ধুত্ব। বলা হয়, 'মানুষ তার সঙ্গী দিয়েই পরিচিত হয়।' সঙ্গীর প্রভাবেই অভ্যাস গড়ে ওঠে, কেউ আলাদা করে শেখায় না। তাই প্রথম বিষয় হলো বন্ধুত্ব, আর আপনি যা অন্যদের দিতে চান তা আপনার নিজের মধ্যেও থাকা উচিত। যুবকদের ক্ষেত্রে এটি আরও সহজ। কারণ, আজকের যুবসমাজ প্রকৃতিগতভাবেই দেশভক্তি ও সেবার গুরুত্ব পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে ভালো বোঝে এবং তারা অনেক বেশি খাঁটি। তাদের উপদেশের চেয়ে উদাহরণ দেওয়া বেশি কার্যকর। তারা যখন কারও চরিত্রের মধ্যে সেই আদর্শ দেখে, তখন তারা বদলে যায়।

মাদকাসক্তি এবং মহিলাদের প্রতি অপরাধের মূল কারণ হলো মূল্যবোধের অবক্ষয়। যেমন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে অসুখ হয়, তেমনই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষা না হলে এই সামাজিক ব্যাধিগুলো দেখা দেয়। আমাদের নিজেদের শরীর, মন ও বুদ্ধির অধিপতি হতে হবে, গোলাম নয়। গীতায় বলা হয়েছে— আত্মা হলো রথের মালিক, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম আর ইন্দ্রিয়গুলো হলো ঘোড়া। বুদ্ধিকে লাগামের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। মহিলাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত মায়ের মতো। গত ১০০-১৫০ বছরে বিদেশি প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবক্ষয় এসেছে, যেখানে মাতৃত্বের চেয়ে সৌন্দর্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিকারে আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি সমাজকেও সচেতন হতে হবে। আর বিদেশের আকর্ষণের বিষয়ে বলি, এখন অনেক যুবকই দেশে ফিরে আসছে, কারণ তাদের মধ্যে দেশের জন্য কাজ করার উদ্দীপনা জেগেছে। আমি এমন অনেক যুবকের দেখা পেয়েছি, যারা বিদেশের ভালো কেরিয়ার ছেড়ে দেশে স্টার্টআপ বা কৃষিকাজে যোগ দিয়েছে। আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বের যেখানে খুশি যাও, কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করো নিজের দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে। ■

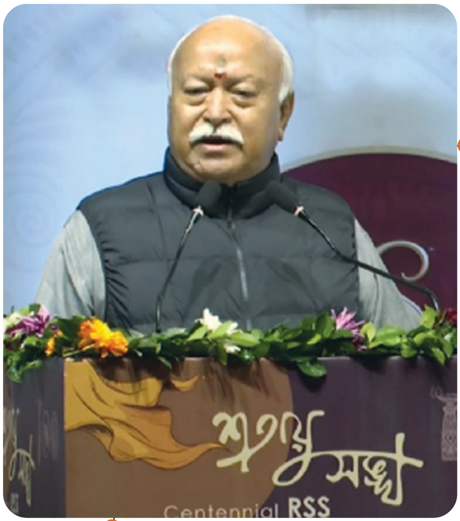




**বর্তমান সেকুলারিজমের যুগে হিন্দুত্বের রক্ষা কীভাবে সম্ভব? হিন্দুত্ব কীভাবে ভারতকে নৈতিক, সামাজিক ও বৈচারিকভাবে শক্তিশালী করেছে? যুবসমাজকে এর জন্য কীভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়?**

আগে বুঝতে হবে যে সেকুলারিজম ও হিন্দুত্ব একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। হিন্দুত্ব হলো একটি জীবনদর্শন বা মূল্যবোধের ব্যবস্থা, আর সেকুলারিজম হলো শাসন পরিচালনার একটি ধারণা। ভারতের ইতিহাসে রাজারা চিরকালই 'পন্থনিরপেক্ষ' ছিলেন; তাঁরা কখনো প্রজাদের মধ্যে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভেদ করেননি। ইউরোপে পোপ ও রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ছিল বলে সেখানে সেকুলারিজম এসেছিল, কিন্তু আমাদের দেশ বরাবরই পন্থনিরপেক্ষ ছিল। ধর্ম মানে কেবল পূজা-পদ্ধতি নয়। মহর্ষি কণাদের মতো দার্শনিক যিনি ঈশ্বর মানতেন না, তিনিও ভারতীয় দর্শনের অংশ। হিন্দুত্ব সত্য, করুণা, পবিত্রতা ও তপস্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই মূল্যবোধই আমাদের সভ্যতাকে হাজার হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছে। যুবকদের অনুপ্রাণিত করার একটাই পথ— নিজে উদাহরণ হওয়া এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ■

**২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশ এবং মহাশক্তিগুলোর (চীন, রাশিয়া, আমেরিকা) সঙ্গে ভারতের বিদেশনীতি কেমন হওয়া উচিত? রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইজরায়েল যুদ্ধ থেকে আমাদের কী শিক্ষা গ্রহণ উচিত?**

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি চলছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছে যে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী হওয়া জরুরি। খাদ্য, সুরক্ষা ও অর্থনীতিতে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। শক্তিশালী হলে বিশ্ব ভারতের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ দিতে বাধ্য হবে। বিদেশনীতি হওয়া উচিত 'পারস্পরিক' (Reciprocal) —তুমি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে আমরাও ভালো ভালো ব্যবহার করব। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ (People to People relations) বাড়াতে হবে। বর্তমান বিদেশনীতি সঠিক পথেই চলছে, শুধু এর গতি বাড়ানো এবং সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ■

**মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা সমাধানে সঙ্ঘের ভূমিকা কী?**

আমি সম্প্রতি মণিপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে মনের দূরত্ব ঘোচানোই সবচেয়ে বড়ো কাজ। উত্তর-পূর্বের মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে একত্বের ভাব জাগাতে হবে। এটি দীর্ঘমেয়াদি কাজ কিন্তু বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্ভব। ■

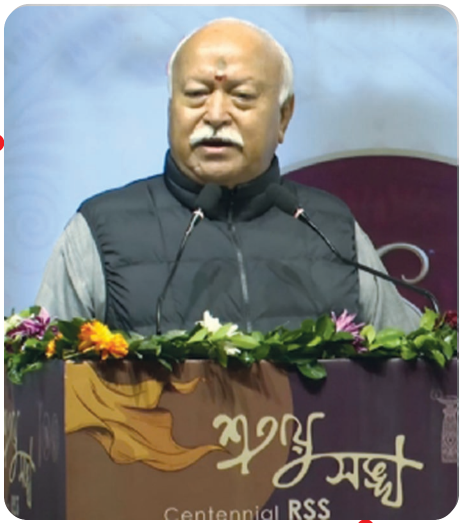


**রেলস্টেশন বা বাস স্ট্যান্ডের মতো জনসমাগমস্থল পরিষ্কার রাখতে আমরা কী করতে পারি ?**

এটি ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয়। আমাদের নিজেদের ঘর ও বাড়ির সামনের রাস্তা পরিষ্কার রাখার মাধ্যমেই এর শুরু হতে হবে। ইন্দোর শহর আজ স্বচ্ছতার এক বড়ো উদাহরণ। আমাদের অভ্যাস করতে হবে যেন আমরা কোথাও নোংরা না করি। আমরা যদি নিজেরা নোংরা না করার শপথ নিই ও বন্ধুদের উৎসাহিত করি, তবেই পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পাড়ায় পাড়ায় কাজ করছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব। ■

**আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা রোবোটিক্সের যুগে আধ্যাত্মিকতা ও দেশভক্তির সমন্বয় কীভাবে সম্ভব ?**

জ্ঞান কখনো অপবিত্র হয় না, কিন্তু তার ব্যবহার বিবেক দিয়ে করতে হয়। রাবণেরও অনেক জ্ঞান ছিল কিন্তু তার মূল্যবোধ ও বিবেক ছিল না, অন্যদিকে শ্রীরামের জ্ঞান ও বিবেক দুই-ই ছিল। আমাদের যুবকদের প্রযুক্তির পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। ত্যাগ ও সেবার মানসিকতা থাকলে প্রযুক্তি বিশ্বের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। ■

**সাধারণ মানুষের জন্য মূলত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসকদের মধ্যে সেবাভাব কীভাবে বাড়ানো যায়? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে কি সেবাভাব সম্ভব ?**

আমাদের প্রস্তাব হলো স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সস্তা ও সুলভ হওয়া উচিত। কেবল অসুস্থতার চিকিৎসা নয়, 'সুস্থ থাকার' ওপর জোর দিতে হবে, যার মধ্যে যোগ ও আয়ুর্বেদ অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসা ব্যবস্থা 'মাল্টি-প্যাথি' হওয়া উচিত যেখানে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করা হবে। চিকিৎসকদের বুঝতে হবে যাতে ছোটোখাটো সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভিড় না বাড়ে। যেমন সাধারণ কাশির জন্য মধু ও জায়ফলের গুঁড়ো ব্যবহার করে উপশম সম্ভব। ■

**পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদের যোগ্য সম্মান দিতে সঙ্ঘ কী পদক্ষেপ নেবে ?**

প্রফুল্ল চাকী বা উল্লাসকর দত্তের মতো বিপ্লবীদের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। সমাজ যদি তাঁদের সম্মান জানানোর উদ্যোগ নেয়, সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। বিপ্লবীদের বীরত্বগাথা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ■

ফঃ ৫

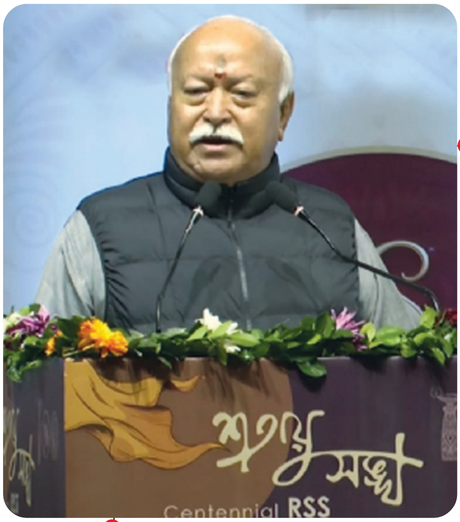




**পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান ইসলামি কট্টরবাদ, অনুপ্রবেশ এবং হিন্দুদের ওপর হিংসা নিয়ে সঙ্ঘের অভিমত কী? হিন্দুদের এই দুর্দশা কবে শেষ হবে ?**

পশ্চিমবঙ্গ কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল রাজ্য। অনুপ্রবেশ ও ইসলামি কট্টরবাদের কারণে হিন্দুদের দুর্দশা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এর একমাত্র সমাধান হলো হিন্দু সমাজকে সংগঠিত হওয়া। একটি সঙ্ঘবদ্ধ সমাজই পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে। ভারত সরকারকেও সীমান্ত সুরক্ষা ও হিন্দুদের স্বার্থে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বের সমস্ত হিন্দুর উচিত বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানো ■

**মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং জাতীয় শিক্ষার ধারায় যুক্ত করার বিষয়ে আপনার মতামত কী ?**

এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মজহবি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও জাতীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। সব ধর্মের প্রতি সম্মান এবং উগ্রপন্থা ত্যাগের শিক্ষা সেখানে থাকা প্রয়োজন। কিছু রাজ্যে প্রশাসনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং সামাজিক আলোচনার মাধ্যমে একে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। ■

**মুসলমানদের মধ্যে সঙ্ঘ সম্পর্কে যে ভুল ধারণা (মুসলমান বিরোধী) আছে তা দূর করবেন কীভাবে? সরকারি অর্থে ধর্মীয় স্থান নির্মাণ কি উচিত ?**

সঙ্ঘ একটি উন্মুক্ত সংগঠন, যে কেউ এসে আমাদের কাজ দেখতে পারেন। আমরা কট্টর জাতীয়তাবাদী বা মুসলমান বিরোধী নই। পূজাপদ্ধতি আলাদা হলেও আমরা সবাই এই দেশেরই সন্তান সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আর ধর্মীয় স্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। সমাজকেই এগিয়ে এসে অর্থ সংগ্রহ করে তা নির্মাণ করা উচিত, যেমনটি শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির বা সোমনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে হয়েছে। ■

**ভারতে ধর্মান্তরণ কীভাবে ঠেকানো সম্ভব ?**

ধর্মান্তরণের মূল কারণ হলো আমাদের নিজেদের সমাজের মানুষদের অবহেলা করা। আমাদের উচিত পিছিয়ে পড়া মানুষদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি তাদের আপন করে নিই, তবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। ■

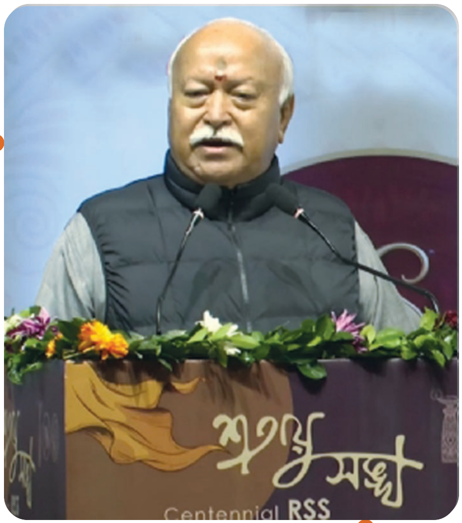


## সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে কি হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা যায়? জাতিভেদ প্রথা কি হিন্দুত্বের অঙ্গ ?

আবহমানকাল ধরেই ভারত হলো হিন্দু রাষ্ট্র। এর জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। হিন্দুত্ব মানেই হলো সর্বসমাবেশী সংস্কৃতি। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়; এটি সময়ের সঙ্গে আসা একটি বিকৃতি। ড. আম্বেদকরও বলেছেন যে অতীতে এই বৈষম্য ছিল না। আমাদের জাতীয় পরিচয় হলো আমরা সবাই হিন্দু বা ভারতীয়। ■

## বামপন্থীরা বলে মনুস্মৃতির অনুসারী হওয়ার কারণে সঙ্ঘ মহিলা বিরোধী। আপনার মত কী ?

সঙ্ঘ মহিলা বিরোধী নয়। সঙ্ঘের নিজস্ব সংবিধান আছে। ‘রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি’র মাধ্যমে মহিলা সংগঠনের কাজ চলছে। আমি নিজে তৃতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবক। আমাদের পরিবারে মায়েরা অনুমতি না দিলে আমরা শাখায় যেতে পারতাম না। এগুলি কেবল আমাদের বদনাম করার জন্য ছড়ানো একপাক্ষিক রটনা। ■

## রেললাইন বা পরিকাঠামোয় নাশকতামূলক কাজের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সঙ্ঘ ও সরকারের কী করণীয় ?

সমাজকে শক্তিশালী ও চরিত্রবান হতে হবে। সমাজ যখন সংগঠিত হয়, তখন কোনো দুষ্কৃতী আক্রমণ করার সাহস পায় না। হাতি যখন তার শক্তি প্রদর্শন করে, তখন সিংহও তাকে সমীহ করে। আমাদের নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ■

## জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হিন্দু সমাজে সন্তান জন্ম দেওয়ার অনীহা— এই বৈপরীত্য নিয়ে সঙ্ঘের ভাবনা কী ?

জনসংখ্যার ভারসাম্য প্রয়োজন। পরবর্তী ৫০ বছরের কথা মাথায় রেখে একটি সামাজিক জনসংখ্যা নীতি তৈরি করা উচিত যা সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। পরিবার হলো আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি। দায়িত্ব এড়ানো সমাজের জন্য মঙ্গলজনক নয়। চিকিৎসকরা বলেন স্বাস্থ্য ও সামাজিক ভারসাম্যের জন্য অন্তত তিনটি সন্তান থাকা আদর্শ ব্যবস্থা। ■

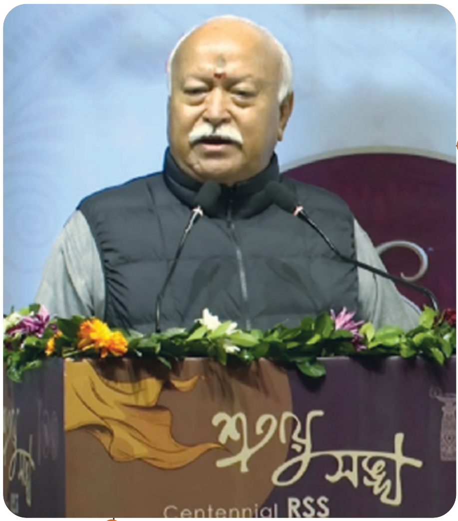




### সমাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে না কেন ?

দুর্নীতি মনের রোগ। কেবল আইন দিয়ে এটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন করতে হবে। যখন মানুষের মনে পাপ-পুণ্যের বোধ ও নৈতিকতা ফিরবে, তখনই দুর্নীতি নির্মূল হবে। আগে মানুষের মধ্যে ভগবানের নামে মিথ্যা না বলার যে ভয় ছিল, তা আজ হারিয়ে গেছে। ■

### সঙ্ঘ কেন বিজেপি নেতৃত্বের থেকে দূরত্ব থাকছে ?

এটি একটি ভুল ধারণা। বিজেপিতে আমাদের অনেক স্বয়ংসেবক আছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মধুর। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা এক ও অভিন্ন পরিবারের অংশ। সংবাদমাধ্যমের তৈরি করা কোনো কাল্পনিক বিভেদে কেউ বিশ্বাস করবেন না। ■

*প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজী সকলের উদ্দেশে বলেন যে, ভারতের আসল শক্তি তার একতায়। আমরা কে, তা ভুলে গিয়েছিলাম বলেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আজ সময় এসেছে সেই গৌরবময় পরিচয়কে ফিরে পাওয়ার। যেমন ঘোড়াকে সচল না রাখলে বা রুটি না উলটালে বা পান না স্থান বদল করলে তা নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি সমাজকে সচল ও সক্রিয় না রাখলে অবক্ষয় অনিবার্য। আমাদের বিভেদ ভুলে এক হতে হবে। আসুন, সঙ্ঘকে কাছ থেকে দেখুন এবং দেশ গড়ার কাজে শামিল হন।*

জন্মদিনে দিলীপ দোশীকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন স্পিনারকে নয়, এক অধ্যবসায়ী ক্রিকেটারকে সম্মান জানানো— তিনি দেরিতে সুযোগ পেয়েও নিজের দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব আর নিয়ন্ত্রণ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন।

### জন্মদিনে ফিরে দেখা

# ভারতের অন্যতম সেরা স্পিনার দিলীপ দোশী

**নিলয় সামন্ত**

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে কিছু নাম আছে, যাঁরা সংখ্যার আড়ালে থেকে গিয়েও প্রভাবের দিক থেকে অনন্য। দিলীপ দোশী ঠিক তেমনই এক বাঁহাতি স্পিনার— যাঁর কেরিয়ার শুরু দেরিতে, কিন্তু প্রভাব ছিল গভীর ও স্মরণীয়। জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক সেই ক্রিকেটারকে, যিনি গুজরাটে জন্মেও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নিজেকে পুরোপুরি বাঙ্গালি করে তুলেছিলেন।

১৯৭৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে অভিষেক হয় দিলীপ দোশীর। সেই সময় টেলিভিশনে লাইভ খেলা দেখার সুযোগ ছিল সীমিত; রেডিয়োই ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের একমাত্র ভরসা। বহু স্কুলপড়ুয়া ক্রিকেটপ্রেমীর মতোই অনেকেই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রেডিয়োতে খেলার ধারাবিবরণী শুনতেন। সেই ধারাবিবরণীতেই প্রথম জানা যায়— পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক বাঁ-হাতি স্পিনারের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। তিনি বাঙ্গালি নন, কিন্তু এই বঙ্গে এসে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একেবারে আপনজন।

সৌরাষ্ট্রের রাজকোটে জন্ম নেওয়া দিলীপ দোশী পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্সই তাঁকে জাতীয় দলে পৌঁছে দেয়। যেমন পরবর্তীকালে অরুণ লালকে পশ্চিমবঙ্গ আপন করে নিয়েছিল, ঠিক তেমনভাবেই দিলীপ দোশীকেও বাংলা ক্রিকেট আপন করে নিয়েছিল।

মাদ্রাজ টেস্টে ভারত প্রথমে ফিল্ডিং করে। সেই ম্যাচেই নিজের প্রকৃতি চিনিয়ে দেন দোশী। প্রথম ইনিংসে তিনি ১০৩ রানে ৬টি উইকেট নেন, দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৬৪ রানে ২টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে এই পারফরম্যান্স তাঁকে ম্যাচের সেরা বোলারদের সারিতে তুলে আনে।

দোশীর বোলিং ছিল চোখে পড়ার মতো। একটু কোনাকুনি রান-আপ, অম্পায়ারের মাঝ বরাবর এসে লম্বা হাত ঘুরিয়ে বল ছাড়া— তাঁর অ্যাকশন অনেকেরই মনে করিয়ে দিত বিষেণ সিংহ বেদীর কথা। যদিও বেদীর মতো অতটা ফ্লাইট ছিল না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও ধারাবাহিকতা ছিল দোশীর বড়ো শক্তি। বোলিং শুরু করার আগে বাঁ হাতে বল ধরে ডান হাতে চশমা ঠিক করা, ফুল হাতা শার্টে বোতাম দেওয়া সাজ— সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, অনেক বাঁ-হাতি বোলার যেখানে একটি হাতেই ভরসা রাখেন, দোশী সেখানে রান-আপের সময় দু'টি হাতই ব্যবহার করতেন।

ওই সিরিজের শেষ টেস্ট, বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বই), আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দোশীর পারফরম্যান্স। প্রথম ইনিংসে ৪৩ রানে ৫টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রানে ৩টি ইউকেট নিয়ে তিনি সিরিজে নিজের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সেরা বোলিং ১০২ রানে ৬ উইকেট, আর একদিনের ক্রিকেটে সেরা ৩০ রানে ৪ উইকেট।

দিলীপ দোশী ছিলেন সেই বিরল চার ক্রিকেটারের একজন, যাঁরা ৩০ বছরের বেশি বয়সে (৩২ বছর) টেস্টে অভিষেক করেও ১০০ বা তার বেশি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩, মাত্র চার বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তিনি ৩৩টি টেস্টে নিয়েছেন ১১৪টি উইকেট। পাশাপাশি ১৫টি ওডিআইতে তাঁর ঝুলিতে ছিল ২২টি উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৮৯৮, যা তাঁর ধারাবাহিকতার প্রমাণ। ব্যাটিঙে সুযোগ খুব একটা পাননি। সাধারণত ১১ নম্বরে নামতেন। তবুও টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ছিল ১০, যা তাঁর অলরাউন্ড প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলাদলের হয়ে দীর্ঘদিন খেলার পাশাপাশি ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটেও তিনি সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। নটিংহ্যামশায়ার ও ওয়ারউইশায়ারের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স তাঁকে আন্তর্জাতিক মানের স্পিনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। তাঁর ছেলে নয়ন দোশীও কাউন্টি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন বাবার উত্তরাধিকার বহন করে।

তবে দিলীপ দোশীর কেরিয়ারের এক বড়ো দুর্ভাগ্য ছিল— তিনি দীর্ঘদিন বিশ্বখ্যাত বাঁ-হাতি স্পিনার বিষেণ সিংহ বেদীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে ছিলেন। বেদী দর থেকে বাদ পড়ার পরই দোশীর টেস্ট কেরিয়ারের চাকা পুরোপুরি ঘুরতে শুরু করে।

জন্মদিনে দিলীপ দোশীকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন স্পিনারকে নয়, এক অধ্যবসায়ী ক্রিকেটারকে সম্মান জানানো— তিনি দেরিতে সুযোগ পেয়েও নিজের দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব আর নিয়ন্ত্রণ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন।

# সবার দায়িত্ব

সূর্য ক্লাস সিক্সে পড়ে। পড়াশোনায় খুব ভালো। ছবিও আঁকে ভালো। শীতকালে প্রতি বছর ওদের স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যায়। এবারও যাবে ক্যাম্পিং-এ এক পাহাড়ি এলাকায়। তাই সূর্য খুব খুশি। আর তিনদিন পরই ওরা রওনা হবে। ব্যাগপত্র সব গুছিয়ে নিয়েছে।

দেখতে দেখতে তিনদিন পেরিয়ে গেল। সূর্য ব্যাগপত্র নিয়ে স্টেশনে এল। বন্ধুরা আগেই এসে গেছে। সবার সঙ্গে ও দেখা করল। স্যারেদের নমস্কার জানাল। তারপর ট্রেনে উঠে যে যার সিটে বসে পড়ল। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ওরা যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে ওরা ঠিক করল কাছেই পাহাড়ের নীচে এক পিকনিক স্পটে গিয়ে ক্যাম্প করবে। সেইমতো তারা জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখল ওই জায়গায় শহর থেকে আসা কয়েকটি পারিবার কারও জন্মদিন পালন করছে। একটু দূরে ওরা চারজন চারজন করে এক-একটি তাঁবু খাটিয়ে ফেলল। সূর্যরা চার বন্ধু তাঁবুর ভেতরে ঢুকে কম্বল গায়ে দিয়ে ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল।

হঠাৎ সূর্যর চোখে পড়ল জন্মদিন পালন করতে আসা লোকগুলো ডিজের তালে উদ্দাম নাচছে আর সেই সঙ্গে গেলাসে, বোতলে করে কী যেন খাচ্ছে। খাবার পর সেখানেই সব ফেলে দিচ্ছে। সারাদিনে ওদের ব্যবহৃত এঁটো থার্মোকলের থালা, গেলাস, বোতল, প্যাকেটে জায়গাটি নরককুণ্ড হয়ে আছে। এসব দেখে সূর্যর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

সূর্য বন্ধুদের কিছু না বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আবর্জনাগুলো তুলে তুলে পাশেই একটা গর্তে রাখতে শুরু করল। সেই দেখে ওর তিন বন্ধুও তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ওর সঙ্গে হাত লাগাল। তারপর সব বন্ধুরা যে যার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে হাত লাগাল। স্যারেরাও এসে হাত লাগালেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জন্মদিন পালন করতে আসা লোকগুলো তাদের ডিজে বন্ধ করে,নাচ-গান থামিয়ে এসে হাত লাগাল। দেখতে দেখতে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তারপর হাত-পা ধুয়ে সবাই নিজের নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল। সূর্য ওর বন্ধুদের বলল, দেখো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সবাই পছন্দ করে। উপদেশ না দিয়ে নিজে থেকে হাত লাগালে অন্যদের মনেও প্রভাব সৃষ্টি করা যায়।

নবাঙ্কুরের বন্ধুরা, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখলে নিজেরাই উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিলে মানুষের মধ্যে উদাহরণ সৃষ্টি করা যাবে। আর তখন অনেকেই তা করতে শুরু করবে। এটা সবারই দায়িত্ব।

**সপ্তর্ষি রায়, ষষ্ঠশ্রেণী, লেকটাউন, কলকাতা-৪৮।**

জাতীয় উদ্যান

# খিরগঙ্গা

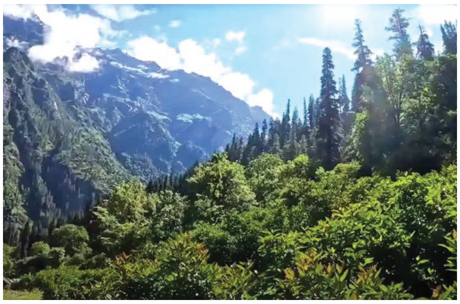

হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার পার্বতী উপত্যকায় অবস্থিত খিরগঙ্গা জাতীয় উদ্যান। ৭১০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। কুল্লু শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। উদ্যানের নিম্ন দেশে পাইন, দেবদারু বৃক্ষ এবং আলপাইন তৃণভূমি রয়েছে। উদ্যানটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই উদ্যান বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, যার মধ্যে রয়েছে তুষার চিতা, হিমালয়ান কালো ভাল্লুক, হিমালয়ান তাহর, বার্কিং ডিয়ার, হিমালয়ান ওয়াজেল এবং হলুদ গলাযুক্ত মার্টেন। ২০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে, তার মধ্যে হিমালয়ান মোনাল, রঙিন তিতির, হিমালয়ান বড়ো তিতির, সোনালি ঈগল, বড়ো শকুন, কোকলাস ফিজ্যান্ট এবং পাহাড়ি বুলবুল। সরীসৃপের মধ্যে রয়েছে কুকরি সাপ, ছোটো টিকটিকি এবং কিলব্যাক নামের অবিষাক্ত সাপ। জুলাই থেকে আগস্ট মাস এই উদ্যান পরিদর্শনের উপযুক্ত সময়।

## এসো সংস্কৃত শিখি-৯৫

**দক্ষিণতঃ (ডানদিকে)**
**কৃষ্ণফলকস্য দক্ষিণতঃ চিত্রম্ অস্তি।**
ব্ল্যাকবোর্ডের পেছনে ছবি আছে।

**অভ্যাস কুর্মঃ –**
বিপ্লবস্য দক্ষিণতঃ শ্রাবণী অস্তি।
নদ্যাঃ দক্ষিণতঃ শিবালয়ঃ অস্তি।
কার্যালয়স্য দক্ষিণতঃ বিপণিঃ অস্তি।

**প্রয়োগং কুর্মঃ --**
**দক্ষিণতঃ** দ্বারা বাক্যাণি রচয়াম
(**দক্ষিণতঃ** দ্বারা কয়েকটি বাক্য রচনা করবো)

---

## ভালো কথা

# চন্দ্রমল্লিকা

আমি গত বর্ষার পর সুমনাদের বাড়ি থেকে একটি চন্দ্রমল্লিকার চারা একটি টবে লাগিয়েছিলাম। গাছটি এই কয় মাসে বেশ ঝাঁকড়া হয়ে অনেক কুঁড়ি এসেছে। আমি গুনে দেখলাম পঁচাত্তরটি। গোড়ার দিকে আরও ছোটো ছোটো কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় একশোটি ফুল ফুটবে। আমার ভাই সারাদিনে অনেকবার গুনে দেখে। আমি ভাবছি একশোটি ফুল ফুটলে কত মজা হবে। আমি ঠাকুমাকে বলে রেখেছি, গোপালের পূজার জন্য না তুলতে। টবটিকেই গোপালের আসনের কাছে রেখে দেবো।

**প্রিয়া সেন,** সপ্তমশ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) ন্তী ন্ম জ জ | (১) রী র ব দ জ খ কা ল |
| (২) ক জ তি য় | (২) জ ং ল ল ৎ ত র ব |

| **২২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর** | **২২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর** |
|---|---|
| (১) আদরিণী (২) আদিকবি | (১) অবিচলচিত্ত (২) অমৃতসাগর |

(১) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (৪) শুভম সরকার, নৈহাটি, উ: ২৪ পরগনা।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০


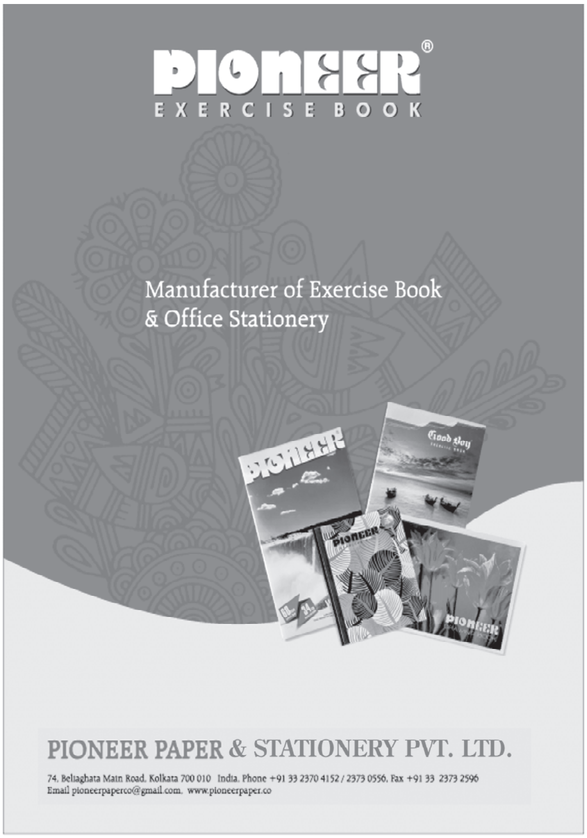



## নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

# আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ২ নভেম্বর কলকাতার একল ভবনে আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তা সম্মেলন। আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সকল কার্যকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র প্রমুখ-সহ সংগঠনের একাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা ও অনেক বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রচারক ও অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র প্রমুখ সঞ্জীবন কুমার রোগ নিরাময়ে যোগচর্চার ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর গভীর ও সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সহ-সংগঠন সম্পাদক ও অখিল ভারতীয় সহ-আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ প্রমুখ রাজেশ কর্মকার, পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল ও আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি জয়ন্ত সেন। সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক ও স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান জুড়ে উপস্থিত থেকে সম্মেলনে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেন। তাঁদের বক্তব্যে আরোগ্য ভারতীর আদর্শ, লক্ষ্য ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এই সম্মেলনে ৬৮ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বক্তাদের আলোচনায় সুস্থ জীবনশৈলী গঠনের গুরুত্ব এবং সর্বাগ্রে মানুষের আরোগ্য কামনাকে কেন্দ্র করে আরোগ্য ভারতীর কর্মকাণ্ড ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। আয়োজকরা মতপ্রকাশ করেন যে, এই কার্যকর্তা সম্মেলনের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আরোগ্য ভারতীর সাংগঠনিক কার্যকলাপ আরও গতিশীল ও বিস্তৃত হবে এবং সমাজে সুস্থতা ও স্বনির্ভর স্বাস্থ্যচেতনার প্রসারে নতুন দিশা উন্মোচিত হবে।

# বেলেঘাটা নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ পদযাত্রা

বিগত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইসলামি জেহাদিরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দীপু চন্দ্র দাস, পলাশ সরকার ও অমৃত মণ্ডলকে। সনাতনীদের হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি জোরপূর্বক জমিদখল, তাঁদের বাড়ি-দোকানঘর লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং হিন্দু নারীদের সম্ভ্রমহানির প্রতিবাদে গত ২৬ ডিসেম্বর বেলেঘাটা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটায় বরফকল মোড় থেকে বেলেঘাটা পোস্ট অফিস পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ পদযাত্রা আয়োজিত হয়। শতাধিক নাগরিক এই প্রতিবাদী পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা সাংগঠনিক মহানগরের

পূর্বভাগ সহ-সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ নন্দী, পূর্বভাগ কুটুম্বপ্রবোধন প্রমুখ অজয় দাশগুপ্ত, পূর্বভাগের সদ্ভাবনা ও পর্যাবরণ প্রমুখ শম্ভু ভৌমিক, বেলেঘাটা সাংগঠনিক নগরের সম্পর্ক প্রমুখ দীপক দেবনাথ। মোমবাতি প্রজ্বলন ও নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে পদযাত্রাটি শেষ হয়।

ফঃ ৬

# বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সনাতনীদের বাংলাদেশ দূতাবাস অভিযান

গত ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার ভালুকায় জেহাদিরা হত্যা করে দীপু চন্দ্র দাশকে। গত ২৩ ডিসেম্বর বগুড়া জেলায় পলাশ সরকারকে পিটিয়ে হত্যা করে জেহাদিরা। গত ২৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায় হোসেনডাঙ্গা গ্রামে জেহাদিদের হাতে নিহত হন অমৃত মণ্ডল। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে জেহাদিরা। ঘটে চলেছে একের পর এক পাশবিক হত্যাকাণ্ড। গত ২৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজান এলাকায় ভোর রাতে বাইরে থেকে দরজা আটকে পরপর সাতটি হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রাউজানের বাসিন্দা সুখ শীল ও অনিল শীলের পরিবারের বাড়িগুলি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। ভোররাতে যখন পরিবারের সদস্যরা ঘুমোচ্ছিলেন, তখন দুষ্কৃতীরা বাড়ির বাইরে থেকে দরজায় হুক লাগিয়ে দেয়, যাতে দরজা খোলা না যায়। এরপর পেট্রোল জাতীয় দাহ্য পদার্থ ঢেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সাতটি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনে বাড়ির ভিতর থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, নগদ টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায় সোনার গয়নাও। বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দু যুবকদের হত্যার প্রতিবাদে গত ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস অভিযান করে সনাতনীরা। তাঁদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় হাজার দুয়েক প্রতিবাদী এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন সনাতনীরা। এদিন নিজাম প্যালেসের সামনে থেকে বেকবাগান পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদী পদযাত্রা। শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই। আমরা চাই অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হোক।' তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'যদি অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না করা হয়, তবে আগামীদিনে ফের আমরা ১০ হাজার মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাব।'

গত ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন অফিস ঘেরাও অভিযানে উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করলে এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আহত হন অসংখ্য বিক্ষোভকারী। এদিন কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতেও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের সদস্যরা। হাইকমিশনের সামনে জমায়েত হওয়ার পর হাতে প্ল্যাকার্ড ও মুখে স্লোগান-সহ বিক্ষোভকারীরা অবস্থান শুরু করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন মহম্মদ ইউনুসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কলকাতা পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘মহম্মদ ইউনুস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার হিন্দুবিরোধী।’

এদিন শিয়ালদহ থেকে বেকবাগান পর্যন্ত পদযাত্রার ডাক দেয় বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। পদযাত্রায় শামিল হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, হিন্দু রক্ষা সেনা-সহ একাধিক সংগঠন। পদযাত্রায় শামিল হন অগণিত সাধুসন্ত। শিয়ালদহ থেকে পদযাত্রা শুরু করে বিক্ষোভকারীরা বেকবাগানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে পৌঁছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা জানান যে, তাঁদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ উপদূতাবাসে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। কিন্তু পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে দিতে পুলিশের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে উপদূতাবাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। একটি ব্যারিকেড ভেঙে কিছু বিক্ষোভকারী উপদূতাবাস ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে পুলিশ প্রথমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তারপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এর ফলে কয়েকজন বিক্ষোভকারীর মাথা ফেটে যায়, অসংখ্য ব্যক্তি রক্তাক্ত হন এবং অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে প্রিজন ভ্যানে তুলতে থাকে। এরপর পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এই জমায়েতকে বেআইনি ঘোষণা করে বিক্ষোভকারীদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বিরাট পুলিশবাহিনী ও র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের লাঠিচালনার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভকারীরা পালটা বলেন যে, যতক্ষণ না তাঁরা স্মারকলিপি দিতে পারছেন, ততক্ষণ অবস্থান চলবে। এই বীভৎস আচরণে কলকাতা পুলিশ নয়, এদের যেন বাংলাদেশের পুলিশ মনে হচ্ছে। লাঠিচার্জের ফলে সন্ন্যাসীদেরও রক্ত ঝরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় দীর্ঘক্ষণ থমথমে পরিস্থিতি থাকে। ঘটনাস্থল থেকে ১২ জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা, অর্থাৎ মোট ১৯ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ২৪ ডিসেম্বর ৭ জন মহিলা এবং গত ২৬ ডিসেম্বর ১২ জন পুরুষ বিক্ষোভকারী জামিনে মুক্তি পান।

# দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে তুলসী পূজন দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫ ডিসেম্বর সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ‘দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির’-এর উদ্যোগে প্রণব কন্যা সঙ্ঘের হৃদয়পুর (বারাসাত সন্নিহিত) কেন্দ্রে আয়োজিত হয় তুলসীপূজন এবং তুলসী মাহাত্ম্য বর্ণন বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান। হিন্দুদের কাছে তুলসী অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত উপকারী একটি উদ্ভিদ। গৃহের সব আয়োজনে, সব অনুষ্ঠানে তুলসীমঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ইদানীং এই ঐতিহ্যের বিষয়ে রাজ্যের মানুষ অনেকটাই উদাসীন। শহরাঞ্চলের ফ্ল্যাটগুলিতে তুলসীমঞ্চ রাখার জায়গারও অভাব। লোকৌষধ হিসেবে তুলসীর ব্যবহার মানুষ ভুলে গিয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে গীতাপাঠ, গোসেবা, গঙ্গারতি, শ্রীগোবিন্দ আরাধনার মতোই তুলসীপূজনও অন্যতম পথ। সেই পথেই বছরভর তুলসীর চারা তৈরি, বিতরণ, রোপণ

ও পূজনের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে ‘দেশের মাটি’। সংগঠনটি উৎসাহ দিয়েছে তুলসী সংক্রান্ত পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রকেও। এক দশক ধরে এই কাজ শুরু হয়েছে; ২০২৫ সালেও সেই কাজ সম্পন্ন হলো। এদিন প্রণব কন্যা সঙ্ঘের আশ্রম প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চকে কেন্দ্র করে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষ থেকে তুলসীপূজন করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পূজা করেন আশ্রমের সন্ন্যাসিনী আত্মস্থানন্দময়ী মাতাজী। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী স্নেহাংশু দত্ত। উপস্থিত ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া, ট্রাস্টি মেম্বার অসীমলাল মুখোপাধ্যায়, উপদেষ্টা ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমনা মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বিশ্বাস, রূপালী বর্মণ, ছন্দা হালদার, তুবলী বালা, কবিতা বিশ্বাস, অমৃত বিশ্বাস, রাখী রায় এবং আরও অনেকে। তুলসীর মাহাত্ম্য গুণ ছোটো ছোটো পড়ুয়া এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনদের মধ্যে প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, তুলসী দেবী বা বৃন্দা হলেন কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার সহচরী। প্রতিটি হিন্দু গৃহে পবিত্র বৃক্ষরূপে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন। মূলত, তুলসী হলেন গোলোক বৃন্দাবনে (চিন্ময়জগতে) গোপিকা বৃন্দাদেবীরূপে তুলসী রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবিকা এবং তাঁদের বিচিত্র দিব্য লীলা সম্পাদনের মূল পরিচালিকা। তুলসী গাছের ভেষজ গুণ হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষিত সত্য। তুলসী গাছ যেমন বাতাস বিশুদ্ধ করে, তেমন তুলসী পূজা করার মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতি বিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির আধিপত্যকে অতিক্রম করতে তুলসী পূজা এক অনবদ্য প্রয়াস। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া বলেন, ‘আমরা গত চার বছর ধরে তুলসীপূজন দিবস উদ্‌যাপন করছি। এবারও আমরা সারা বছর ধরে তুলসীর চারা বিতরণ করেছি, তুলসী মাহাত্ম্য আলোচনা করেছি। আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ তুলসীপূজায় অংশগ্রহণ করেছেন। এটা আমাদের ভালো লাগছে যে, বিদেশি সংস্কৃতির করালগ্রাস থেকে ভারতীয়রা আজ মুক্তি চাইছে।’ এদিন তুলসীপূজনের পাশাপাশি প্রণব কন্যা সঙ্ঘের পাঁচদিন ব্যাপী ত্রিশূল উৎসবের শিক্ষা সম্মেলনে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সুচিন্তিত মতামত রাখেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক মিলন খামারিয়া।

# শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রমে স্বামী ভাবাত্মানন্দজী মহারাজের স্মরণ সভা

গত ২৩ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ব্যারাকপুর-স্থিত শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রমে ব্রহ্মলীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাবাত্মানন্দজী মহারাজের স্মরণ সভা এবং ষোড়শী ভাণ্ডারা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপস্থিত থেকে 'শিক্ষাবিদ ও কর্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী ভাবাত্মানন্দজী'-শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। স্বামী ভাবাত্মানন্দজী মহারাজ ছিলেন ভোলানন্দ আশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। ড. চক্রবর্তীর বক্তব্যে উঠে আসে বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের এক হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সূত্র। উঠে আসে ভাবাত্মানন্দজী মহারাজের পরমারাধ্য গুরুদেব স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজের অসাধারণ ভূমিকার প্রসঙ্গ; গুরু-শিষ্য পারম্পর্যে কীভাবে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কীভাবে তা সচল রেখেছিলেন; তৈরি হয়েছিল মহাদেবানন্দ কলেজ, একটি ইংরেজি মাধ্যম-সহ তিনটি স্কুল, একটি কারিগরি শিক্ষণ বিদ্যালয়, একটি ব্যবস্থাপনা শিক্ষার মহাবিদ্যালয় এবং অনাথাশ্রম— তার কথা। মহারাজের স্মরণসভায় অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁকে একজন 'কর্মযোগী সন্ন্যাসী' বলে অভিহিত করেন। মহারাজের দৃঢ় মত ছিল কর্মের দ্বারাই ধর্মের মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এবং এই কর্মে আবশ্যিক বিষয় হবে শিক্ষা বিস্তার তথা বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠা। উপস্থিত সাধুসন্ত ও ভক্তমণ্ডলীর কাছে অধ্যাপক চক্রবর্তী ব্রহ্মলীন মহারাজের পুণ্য জীবনী উপস্থাপন করেন।

# কলকাতা প্রেস ক্লাবে রাসবিহারী বসু স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বড়োলাট হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের এই দুঃসাহসী কাজে কেঁপে ওঠে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের ভিত। গত ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও গিরিদুত মানমন্দিরের উদ্যোগে ঘটনাটির স্মরণে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। সার্ধশতবর্ষে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ষীয়ান সাংবাদিক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ও কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে 'সুখবর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী শমীক স্বপন ঘোষকে 'রাসবিহারী বসু স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবন সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য শ্রীঘোষ এই পুরস্কার বাবদ তাঁর প্রাপ্ত অর্থ (এক লক্ষ টাকা) ইনস্টিটিউটকেই পুনরায় দান করেন।

# রায়গঞ্জে নরেন্দ্র কাপ মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ২৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ সসোহারই সিধু-কানহু মার্শাল ক্লাব ফুটবল ময়দানে মহা সমারোহে সম্পন্ন হলো নরেন্দ্র কাপ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ৮টি বিধানসভা থেকে ৮টি মহিলা ফুটবল টিমের এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন নিমাই কবিরাজ, বিশ্বজিৎ লাহিড়ী, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্টজন। ক্রীড়া সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা কেশবানন্দ পাল জানান, 'শরীর-মাদ্যঃ খলু ধর্ম সাধনম্', অর্থাৎ শরীরচর্চা হলো ধর্ম সাধনার প্রথম সোপান। শরীর ভালো থাকলে সব ভালো। নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন সমিতি বিশ্বাস করে ছেলেমেয়ে উভয়েই সমান। এজন্য ছেলেদের সঙ্গে মহিলা টিমেরও খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

# এবিআরএসএম, পশ্চিমবঙ্গ (উচ্চশিক্ষা)-এর কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গ

গত ২১ ডিসেম্বর বর্ধমানে কার্জনগেটের নিকটে উমা ভবনে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ (উচ্চশিক্ষা) মধ্যবঙ্গ প্রান্তের যোজনায় একদিনের কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গের কার্যক্রম আয়োজিত হয়। অভ্যাসবর্গটি চারটি সত্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়গুলি ছিল: (১) উদ্বোধনী সত্র : সঙ্ঘের শতবর্ষে সংগঠনের ভূমিকা। (২) এবিআরএসএম কী এবং এই সংগঠনের কাজ কী? (৩) সদস্যতা অভিযানের অনুভব, সমস্যা এবং তার সমাধান। (৪) সমারোপ সত্র। মধ্যবঙ্গ প্রান্তের আটটি জেলা এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৩২ জন কার্যকর্তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রদেশ স্তর থেকে চারজন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই অধ্যাপক ড. অনুপম বেরার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং কল্যাণ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শেষ হয়।

# বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলছে

বাংলাদেশে হিন্দুদের অমানবিকভাবে হত্যা করে চলেছে তা ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ বহুদিন ধরে প্রত্যক্ষ করছে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য মানুষ জেহাদি নরখাদকদের খাদ্য হয়ে উঠেছে এটা ভাবলেও আঁতকে উঠতে হয়। সম্প্রতি দীপু চন্দ্র দাসের পৈশাচিক হত্যা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে— বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য দুটি রাস্তা খোলা আছে। এক, ইসলাম গ্রহণ করুক, নয়তো চলে যাক ভারতে। হজরত মহম্মদকে নিয়ে যারা কটূক্তি করবে, তাদের অবস্থাও দীপু দাসের মতো হবে। দীপু চন্দ্র দাস ইসলাম নিয়ে কী কটূক্তি করেছেন তার কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, সে ইসলাম নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছে, তাহলেও তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে হবে? ইসলাম কি এতোই দুর্বল যে কেউ যদি তার বিপক্ষে কিছু বলে তাহলে পুরো ইসলাম খারাপ হয়ে যাবে? ইসলাম যদি মহানই হয় আর আল্লা যদি সকলের মঙ্গলের কথা বলেন তাহলে এতো ভয় কেন? নাকি ভীতি সঞ্চার করে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের মহান ইসলামকে রক্ষা করতে হবে, প্রচার করতে হবে, দাওয়াত দিতে হবে?

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদ করছে। কিন্তু অবাক হতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের একাংশকে নিয়ে। যারা নিজেদের বাঙ্গালি, বাঙ্গালিয়ানা, বাঙ্গালি অস্মিতা রক্ষা নিয়ে বড়াই করে তারা আজকে বাংলাদেশের বাঙ্গালিদের জন্যে কেন পথে নামছে না? কেন তারা প্রকাশ্যে বাংলাদেশে হিন্দুহত্যার প্রতিবাদ করছেন না? আসলে বাঙ্গালি বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও এটা একটা মুখোশ, আসল কারণ মুসলমান তোষণ আর ভোটব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখা। তাই বাঙ্গালি হিন্দুদের বাঁচতে এদের বাদ দিয়েই লড়ায়ে নামতে হবে, এদের মুখোশ মানুষের সামনে খুলে দিতে হবে। তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা বাংলাদেশের মতোই হবে, যেমন মুর্শিদাবাদের হরগোবিন্দ দাস এবং তার পুত্র চন্দন দাসের মতো অবস্থা হয়েছে।

ভারত সরকারের উচিত বাংলাদেশের হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশের ওপর বাণিজ্যিক ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে তারা হিন্দুদের হত্যা, মা-বোনেদের সম্মানহানি, সম্পত্তি লুঠ থেকে বিরত হয়।

—**সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়,**
শিবপুর, হাওড়া-২।

# পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা চরম সংকটে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন বিতর্ক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তা হলো, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নীরবে, ধীরে, পরিকল্পিতভাবে 'বাবরি মসজিদ নির্মাণ'-এর নামে সংগঠিত হচ্ছে সন্দেহজনক শিলান্যাস কর্মসূচি। কেন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাবরি মসজিদ? এই প্রশ্ন আজ সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যেমন তীব্র, তেমনই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মনেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনাকে আতসকাঁচের নীচে রেখে এখন ওয়াকিবহাল মহলের স্পষ্ট বক্তব্য, অর্থের উৎস যদি স্বচ্ছ হয়, তাহলে প্রশ্ন নেই। কিন্তু অস্বচ্ছতা দেখা গেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে কঠোর তদন্তে নামা। সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট— বহিরাগত উৎস, বিদেশি ফান্ডিং, রাজ্যের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি ও মোল্লাবাদী প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আশ্রয়ে এই কাজ এগোচ্ছে কিনা, তা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে খতিয়ে দেখা জরুরি। প্রশ্ন আরও বড়ো, যদি প্রতিটি জেলায় এভাবে বাবরি মসজিদ তৈরির প্রক্রিয়া চলে, তাহলে হিন্দুদের নিরাপত্তা কোথায়? এটাই আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রধান আতঙ্ক। জমি অধিগ্রহণ, নিঃশব্দে ফান্ডিং, অদৃশ্য সংগঠনের উপস্থিতি— এসবই দেশবিরোধী কার্যক্রমের অশনি সংকেত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

সমাজ মাধ্যমে কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। সন্তু শিকদার তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলায় যদি বাবরি মসজিদ তৈরির নামে সাংগঠনিক অনুপ্রবেশ ঘটে, তা হলে ২০৩০-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু অস্তিত্ব চরম সংকটে পড়বে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ বাড়ানো।

জগন্নাথ মণ্ডল লিখেছেন— 'এটি কেবল ধর্মীয় স্থাপনা নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ভূমিকম্পের প্রস্তুতি। শিলান্যাশ কর্মসূচির অর্থ কারা দিচ্ছে, সেই অস্বচ্ছতা বিপজ্জনক। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রকে এখনই কঠোর তদন্তে নামতেই হবে।'

সোনা কুমার দাস প্রশ্ন তুলেছেন, 'গ্রামে গ্রামে হিন্দুরা ইতিমধ্যেই নিরাপত্তাহীন। তার ওপর এইভাবে পরিকল্পিত নির্মাণ যদি চলতে থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়?'

দেবর্ষি বিশ্বাস দৃঢ় কণ্ঠে বলেন— 'অর্থের উৎস যদি স্বচ্ছ হয়, আমরা প্রশ্ন তুলব না। কিন্তু অস্বচ্ছতার গন্ধ পেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে দেওয়া যাবে না।'

তারা সবাই হিন্দুদের অস্তিত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি--- শিলান্যাস কর্মসূচির অর্থের উৎস তদন্ত করে বিদেশি ফান্ডিং ও মোল্লাবাদী সংগঠনের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা। প্রতিটি জেলায় নজরদারি ও হিন্দু সমাজের নিরাপত্তা জোরদার করা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে জরুরি বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালু করা। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আজ একটি প্রশ্নই করছে— 'আমরা কি নিজের রাজ্যের সংখ্যালঘু হয়ে যাব?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করাই এখন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

# বিচক্ষণতার অভাবের প্রতিক্রিয়া

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হাওয়া উঠেছিল, 'বিজেপি আসছে, বিজেপি আসছে'। এতেই

হয়ে গেল বঙ্গ বিজেপির সর্বনাশ। দলে ঢুকে গেল তৃণমূলের বেশ কিছু দাগি লোকজন। মানুষ যাদের ঘৃণা করত রাতারাতি তারাই হয়ে উঠলো বিজেপির নয়নের মণি। মানুষ মোটেই এ সব ভালোভাবে নেয়নি। ফলও তাই হলো। সরকার গড়তে যাওয়া দলের বিজয়রথ ৭৭ আসনেই থেমে গেল। বলাবাহুল্য এই ৭৭ জন বিধায়কের সংখ্যা মোটেই হেলাফেলা ছিল না। কারণ এক সময় এর থেকে অনেক কম বিধায়ক নিয়ে সারা রাজ্য কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে এই ৭৭ জনের সিংহভাগ বিজেপির বিধায়ক কিন্তু বিজেপি হয়ে ওঠেননি। তাই তারা ২০২১ সালের ফল প্রকাশের পর দাঁড়ায়নি তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশে। ঠিক এই ভাবেই কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার কল্যাণ গুপ্তের এক বিবৃতিতে তৎকালীন নকশাল আন্দোলনের বারোটা বাজিয়ে ছিল। সেই সময় ভালো ভালো কৃতী ছাত্ররা নকশাল আন্দোলনে নাম লিখিয়েছিল। সেই সময় কলকাতা পুলিশ কমিশনার ঘোষণা করেন যে, নকশালরা যেকোনো সময় পশ্চিমবঙ্গ দখল করে নেবে। ব্যাস, শুরু হয় তাদের সর্বনাশ। চোর, ডাকাত ও তার কাটা পার্টির লোকজন ঢুকে পড়ে নকশাল বাড়ি আন্দোলনে। তাদের পরের অবস্থা আর বলার প্রয়োজন নেই।

বিজেপি একটা নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল। ২০২১ সালে তছনছ হওয়া বিজেপি তার নিষ্ঠা, তার আদর্শ নিয়ে সুশিক্ষিত ও উপেক্ষিত বিজেপি কর্মীরা দলের পাশে ছিল। তাই ৫ বছরের মধ্যেই আবার বিজেপি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ চায় বিজেপির হাতে রাজ্যের শাসন ভার তুলে দিতে। আর অন্য দলের সুবিধাবাদ নেতারা লালায়িত বিজেপির ছত্রছায়ায় আসতে। খুঁজছে দালালদের। যাদের কাছে রাজনৈতিক দোকানদাররা নিজেদের বিক্রি করবে। ভয় নেই, এবার সতর্ক বিজেপি। সতর্ক বিজেপির নীতিনিষ্ঠ কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না।

**—শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

# পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

ভারতের ২০২১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিল প্রায় ২৭.০১ শতাংশ, যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭০.৫৪ শতাংশ। সাম্প্রতিক সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা অনুযায়ী ২০২৩ সাল নাগাদ মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৩০ শতাংশ, আর হিন্দু জনসংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় ৬৭ শতাংশে। এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে--- মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

**১. অনুপ্রবেশ : প্রধান উদ্বেগের কারণ :** বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে থাকা পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই অনুপ্রবেশের সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৭১ সালের পর থেকেই সীমান্ত দিয়ে ক্রমাগতভাবে মুসলমান জনসংখ্যার একাংশ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার বহু সীমান্তবর্তী গ্রামে এখন স্থানীয়দের তুলনায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে রাজ্যে বসবাস করছেন, যাদের একটি বড়ো অংশ ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

**২. রোহিঙ্গা জনজাতির অনুপ্রবেশ :** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মায়ানমারের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। দিল্লি ও জম্মু ছাড়াও কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, রোহিঙ্গাদের একটি অংশ ভুয়া নথি ব্যবহার করে রাজ্যে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে। এদের একাংশ পরে বেআইনি ব্যবসা ও চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা সীমান্ত অঞ্চলে জনবিন্যাস ও আইনশৃঙ্খলার নতুন মাত্রা যোগ করছে।

**৩. ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি :** রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ নীতি বারবার আলোচনায় এসেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণ, ইমাম ভাতা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা— এই পদক্ষেপগুলি একদিকে মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক সমর্থন জোরদার করেছে, অন্যদিকে হিন্দু ভোটব্যাংকে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই পরিস্থিতিকে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি হিসেবে দেখছে। তাঁরা দাবি করেছেন, তুষ্টীকরণ নীতি এবং সীমান্তরক্ষার দুর্বলতার ফলেই রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তন ঘটছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক।

**৪. মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধি :** আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রজনন হারের পার্থক্য। মুসলমানদের প্রজনন হার এখনও তুলনামূলক বেশি— প্রায় ২.৩ যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ে তা ১.৬। ফলে ধর্মীয় অনুপাত ধীরে ধীরে মুসলমানদের দিকে ঝুঁকছে।

**৫. ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা :** বর্তমানে এই প্রবণতা থাকলে আগামী দশকে পশ্চিমবঙ্গেব মুসলমান জনসংখ্যা ৩২-৩৩ শতাংশে পৌঁছতে পারে, বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। এতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নতুন প্রশ্ন উঠবে।

জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিসরের একটি গভীর সংকেত। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সীমান্ত নজরদারি বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। নইলে আগামী দশকে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় ভারসাম্য আরও পরিবর্তিত হতে পারে, যার প্রভাব গোটা পূর্ব ভারতের সামাজিক কাঠামোয় পড়বে।

**—বরুণ মণ্ডল,**
নোয়াপাড়া, রাণাঘাট, নদীয়া।

# গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৫৩)

**রাজগুরু স্মৃতি**

১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর লাহোরে ইংরেজ অফিসার স্যান্ডার্সকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবী রাজগুরু এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে পালিয়ে নাগপুরে আসেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে রাজগুরুর পরিচয় আগেই হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে যখন রাজগুরু নাগপুরে ভোঁসলে বেদশালায় বেদাধ্যায়ন করেন তখন কয়েকবার মোহিতের শাখায়ও তিনি এসেছিলেন। এখানেই ডাক্তারজীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। শুধু তাই নয় ভাউজী কাওরের জীবিতকালে ভগৎ সিংহ একবার নাগপুরে এসেছিলেন এবং কাবরে আর্বির নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে, বেঙ্কট নারায়ণ শখদেবকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ওয়ার্ধার বিপ্লবী গঙ্গাপ্রসাদের পরিচয় সূত্রেই এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। অনুমান, নাগপুরে আসার আগেই কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় রাজগুরু ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে রাজগুরু আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে নাগপুরে এলে তার সমস্ত ব্যবস্থাদির, দেখাশোনার ভার ডাক্তারজী গ্রহণ করেন। ডাক্তারজী অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁকে ভাইয়াজী দানীর একটি খামার বাড়িতে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারজী রাজগুরুকে বলেছিলেন তিনি যেন পুনার দিকে না যান। কিন্তু এত সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর অজান্তে রাজগুরু নাগপুর ছেড়ে চলে যান। আর পুনায় যাবার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হন। ডাক্তারজীর কাছে এটা ছিল যেমন হতাশা তেমনি বেদনারও।

(৫৪)

**সঙ্ঘশাখায় মদনমোহন মালব্য**

ডাক্তারজী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রসঙ্গে একবার স্মৃতিকথায় বলেন, পণ্ডিত মালব্যজী যখন সঙ্ঘস্থানে এলেন তখন তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন যে— 'অন্যান্য সংস্থার নিকট বড়ো বড়ো প্রাসাদ ও বিরাট অর্থভাণ্ডার আছে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে মনুষ্যবল ভালো পরিমাণে আছে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে'। সঙ্ঘস্থানে পূজনীয় ডাক্তারজীর সঙ্গে মালব্যজীর বার্তালাপ যারা শুনেছেন তাদের কাছ থেকে আরও বিষয় জানা গেছে। মালব্যজী যখন মোহিতের শাখায় এসেছিলেন তখন ভগ্ন প্রাসাদের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে যদিও খেলাধুলা শাখার কাজ চলছিল। কিন্তু বাকি শাখা সংলগ্ন জায়গা ছিল ইট পাথর ভর্তি, ব্যবহারের অযোগ্য। শাখায় এসে অবস্থাটা মালব্যজীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি বুঝলেন এই ভাঙাচোরা পরিবেশে শাখা চালাতে হচ্ছে মানে সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি ডাক্তারজীকে বললেন, 'লোকেরা আমাকে 'রাজকীয় ভিখারি' বলে। আপনার যদি সম্মতি হয় তাহলে আমি কয়েকজনের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেব। ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন'। 'পণ্ডিতজী, আমার পয়সার জন্য বিশেষ চিন্তা নেই। আমি শুধু আপনার মতো মানুষের আশীর্বাদ চাই'। নিঃসন্দেহের এ ধরনের উত্তর পণ্ডিতজী আশা করেননি। তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন মুদ্রায় বললেন— 'অন্যান্য স্থানে প্রথমে অর্থ ও তার পরে মনুষ্যবলের প্রতি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু আপনার রীতি অভিনব। আপনার এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমি যেখানেই যাব, উল্লেখ না করে থাকতে পারবো না'।

*সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস*